মোপাসাঁ থেকে

মোপাসাঁ থেকে

শ্রীশীতাংশু মৈত্র এম্. এ.

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দাম দু' টাকা
মহালয়া ১৩৫৩

প্রিণ্টার—
বলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭-২, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

রূপান্তরের কৈফিয়ৎ

একটি মাত্র গল্প লিখে মোপাসাঁ বিখ্যাত হন। তাঁর সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই; কারণ একটা ছোট গল্প লিখে পাঠক সাধারণের মনে দাগ কাটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। অবশ্য অশ্লীল সাহিত্যের স্রষ্টা ব'লে তার আগেই মোপাসাঁকে ফ্লবেয়ারের মত আইনের কোপদৃষ্টি সইতে হ'য়েছিল, সেই সূত্রে তাঁর নাম নিন্দার মাধ্যমে কিছু প্রচারিত হয়। তার পরে দুই একটা খ্যাতিহীন গল্প লেখার পর লিখলেন ঐ রাতারাতি নাম-ছড়ানো গল্প 'বুল্ দ সুইফ্'। বাংলায় তাকে আংশিক রূপান্তরিত ক'রে কিছুকাল আগে ননীমাধব চৌধুরী মশায় বাঙালী পাঠকের কাছে নিবেদন করেছেন।

মোপাসাঁ অবশ্য কবিতা, নাটক, উপন্যাসও রচনা করেছেন কিন্তু ছোট গল্পেই তাঁর সিদ্ধি। তাই ব'লে তিনি যত গল্প লিখেছেন সবই যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেতে পারে তা নয়। কোনো সাহিত্যিকেরি সব সৃষ্টি সমানভাবে সার্থক হয় না। তবে এইটেই আশ্চর্যের কথা যে মোটে দশ বছরের মধ্যে এত সার্থক সৃষ্টি মোপাসাঁ করলেন কি ক'রে; কারণ মোটামুটি হিসাবে ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত তাঁর রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনার কাল। তার পরেই তিনি পাগল হয়ে যান এবং সমস্ত অঙ্গ যায় পক্ষাঘাতে প'ড়ে। ৪৩ বছর বয়সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুমার মোপাসাঁ পারীতে মারা যান।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর গুরু বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ্ ফ্লবেয়ার। এমিল্ জোলাও এঁদেরি দলের। এই সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সাহিত্যে বাস্তব জীবন রূপায়নের যে দুঃসাধ্য প্রয়াস করেছেন মোপাসাঁ সেই প্রয়াসকেই নিয়ে গিয়েছেন চরমে—উদাহরণ-স্বরূপ এই সঙ্কলনের

'যমদুত' অথবা 'নিষিদ্ধ ফল' অথবা তাঁর বিখ্যাত গল্প 'হার'এর উল্লেখ করা যেতে পারে। 'হার' গল্পের অন্তর্গূঢ় ব্যঙ্গ এই ধনতান্ত্রিক সমাজে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তরের দীনতাকে অকপটে প্রকাশ করেছে— দেখিয়েছে বর্তমান জীবনের অশান্তির মূল কোথায়, এ জীবনে মহৎ প্রয়াসেরও মূল্য ঐ নকলহীরের হারকে খাঁটি হীরের দাম দেওয়ার মত। আবার 'মিস্ হ্যারিয়েট্' গল্পে নিষ্পিষ্ট প্রবৃত্তির কি করুণ প্রকাশ। 'বেচারী মেয়েটি' গল্পে পতিতা নারীর পতনের ইতিহাস এবং সেই পতনের ফলে যে ছাপ সমাজ তাকে দিয়েছে সেইটাই যে তার সবটুকু পরিচয় নাও হতে পারে, এই বেদনাময় ইঙ্গিত। 'তার ছেলে' তে পিতৃস্নেহের এবং সমাজ চেতনার কি অসহ্য সত্য ছবি! এই সূত্রে মনে পড়ে আমাদের অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসে কি হাস্যকর দুর্বলতা!

মোপাসাঁ চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই দেখার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বাংলা সাহিত্য বাঙালীর জীবনের গ্লানিকে স্পষ্ট ক'রে রূপায়িত করতে এখনও দ্বিধা বোধ করছে, ভয় পাচ্ছে। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখে পাঠক, সম্পাদক সকলের এই দুর্বলতায় বেদনা পেয়েছি মনে; ভেবেছি যে গ্লানি জীবনকে বিষায়িত করছে তাকে এই ভাবে ঢেকে রেখে সমাজের কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে? তাইত দেখি শরচ্চন্দ্রের পর বাঙালী সাহিত্যিকের (দুই একজন ছাড়া) দৃষ্টি একটুও বিস্তৃত হয় নি, তার সমাজ-চেতনা আর একটুও অন্তর্মুখী হয় নি। সমাজ-চেতনা কতকগুলি ইজ্‌মের চর্বিত-চর্বণে পর্যবসিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ বাঙালী পাঠকের তথা, বোধ হয়, ভারতীয় পাঠকের ধারণা, প্রাচ্যের, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের, নীতিবোধ প্রতীচ্যের চেয়ে

উন্নততর ; তাই প্রতীচ্যের জীবনবেদ, এবং সাহিত্যে জীবনের রূপায়ন প্রাচ্যের ধাতে সইবে না। যে দেশ না খেতে পেয়ে, আত্মসম্মান রক্ষা করতে না পেরে, নারীকে ছলে বলে কৌশলে পঙ্গু ক'রে আর পুরুষকে ভাবালু ক'রে দিনে দিনে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর পানে এগুচ্ছে ; যে দেশ জানে না কেমন ক'রে বাঁচতে হয়, যে দেশ খেতে দিচ্ছে না বলে অভিমান ক'রে নির্বিবাদে আত্মহত্যা করে, সেই দেশের নৈতিক বোধের বড়াই করা চলে না। প্রতীচ্য জানে বাঁচতে—তাই নিজের দুর্বলতার সমালোচনাও সে সহ্য করে। আমাদের দেশ বাঁচতেও জানে না, বাঁচতে চায়ও না ; তাই আত্মবিচারে ভয় পায়—ভাবে, যা আছে সেইটুকু টিকলেই বাঁচি।

এই গল্প-সঞ্চয়নে প্রতীচ্য মনের সাহসের এবং সবল আত্মনির্ভরতার পরিচয় বাঙালী পাঠক পাবে ; দেখবে মানুষের মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে ফরাসী, বাঙালীর প্রভেদ কত কম। 'বেচারী মেয়েটি' আমাদের দেশেও হাজারে হাজারে আছে। 'হার' এর মোহ আমাদের দেশেও কিছু কম না। এ হল সভ্যতার একীভবনের যুগ। তাই এই গল্প সংগ্রহ।

তবে অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত মোপাসাঁর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী ক্লিষ্ট হয়েছে ; বিশেষ যখন ফরাসী ভাষার গদ্যের সূক্ষ্ম যাথাযথ্য বাংলা গদ্যের বর্তমান ক্ষমতার বহির্ভূত। তার ওপর অনুবাদকের গতানুগতিক অক্ষমতা ত আছেই।

অভ্যাসবশে মাঝে মাঝে কোন কোন ফরাসী নামের উচ্চারণ ইংরেজীর মত ক'রে ফেলেছি ; সে ত্রুটি বোধ হয় অমার্জনীয় নয়।

মহালয়া
১৩৫৩

ইতি
শ্রীশীতাংশু মৈত্র

মেয়েটি সেই জাতীয়, যাদের দেহ খাসা, যারা মনও ভোলায় কিন্তু ভাগ্যের খেয়ালে জন্মায় এমন ঘরে যারা বংশপরম্পরায় অধস্তন কর্মচারী। তাই যৌতুকের লোভে কোন বড় ঘরের ছেলে যে এই মেয়েটির পথে এসে পড়বে, তাকে বুঝবে, তাকে ভালবাসবে এবং শেষে বিয়েও করবে, সে সম্ভাবনাও নেই। শিক্ষাবিভাগের এক অকিঞ্চন কেরাণীকেই ফলে সে বিয়ে করল।

পোষাকে আভিজাত্য দেখাবার ক্ষমতা না থাকায় কাপড়-চোপড় তার সাদাসিধে—মনে তার সব সময়েই ক্ষোভ, যেন নিজের চেয়ে নীচুস্তরের কোন লোককে সে বিয়ে করেছে। মেয়েরা জাতও চায় না, বংশমর্যাদাও চায় না; তাদের কাছে ও দুটির স্থান দখল করেছে রূপ, রস এবং লীলা। তারা শেখে না কিছু—যেটুকু কৃষ্টি, শোভনতা এবং মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের আছে তা প্রকৃতির দান এবং তারই জোরে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও উঠে পড়ে উচ্চতম শ্রেণীর মেয়েদের পর্যায়ে। মাদাম লোয়াজেল মনে কিছুতেই শান্তি পায় না কারণ তার স্থির বিশ্বাস যে তার জন্মই হয়েছিল বিলাসে আর আলসে ডুবে থাকবার জন্তে। এই দীন, বিষণ্ণ পারিপার্শ্বিকে তার ঘরের দেওয়ালের নগ্ন দারিদ্র্য, পুরানো আসবাব আর চুণ-বালি-খসা ছাদ তাকে বড় পীড়া দিত। যে সমস্ত খুঁটি-নাটি তার শ্রেণীর অন্ত মেয়ের চোখেই পড়ত না সেইগুলোই তার চোখে পড়ে আর সে রাগে, দুঃখে ভ'রে ওঠে। ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে সারাদিনের ঝি-টাকে দেখলেই তার কান্না পায়—উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে সে কামনায়। সে

স্বপন দেখে প্রতীক্ষা-কক্ষের—সেখানে আসবাবে ঝালর লাগানো, সূক্ষ্ম-কাজ করা পারসিক পর্দা তার দুয়োর জানালায়, সেখানে জ্বলছে পিতলের বাতিদানে আলো, আর ঘরের অগ্নিকুণ্ডের মাদক উত্তাপে ঘুমিয়ে পড়েছে আরাম-কেদারার উপর লম্বা উর্দিপরা আর্দালি। সে স্বপন দেখে প্রশস্ত, রেশমের পর্দা-টাঙানো বসবার ঘরের—সেইখানে টেবিলে সাজানো প্রাচীন-কলা-সমৃদ্ধ অমূল্য, অপূর্ব সব গহনা। তারপর তার স্বপনে দেখা দেয় সুরভিত অনুপম খাস্-কামরা—সেখানে বৈকালিক আসরের প্রলোভনে আসবে সেই সব খ্যাতিমান, প্রতিপত্তিমানেরা যাদের মনোহরণ সব মেয়েরই কাম্য।

তিন দিনের পুরানো টেবিল-ক্লথ পাতা গোল টেবিলটায় তার ঠিক বিপরীতেই খেতে ব'সে তার স্বামী ঝোলের ডিসের ঢাকনি খুলেই আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ্যাঁ, ঝোল হয়েছে মাংসের, বল কি! ঠিক যেটি আমি চাই।' কিন্তু স্ত্রীর মন তখন প্রাচীন মূর্ত্তি-আঁকা রূপকথার বনে অদ্ভুত পাখী-আঁকা পর্দায় সুশোভিত ঘরে মনোহর চাঁদির বাসনে মনোহর ভোজের চিন্তায় মগ্ন: চমক-লাগানো পিরিচে সুস্বাদু খাদ্য, মাছের লালচে নরম মাংস অথবা সুপুষ্ট মুরগীর ডানা, অলস ভাবে নাড়তে নাড়তে মৃদু অর্থহীন কানে কানে কথায় মুখে-ফুটে-ওঠা জটিল হাসি।

তার না আছে ভাল ঘাঘরা, না আছে জড়োয়া গহনা, না কিছু; অথচ এ সব ছাড়া আর সে কিছুই চায় না। এই সব কিছু পাবার জন্যেই ত তার জন্ম। কি আনন্দই হত যদি তার দিকে চেয়ে থাকত লোকে, তাকে দেখে মুগ্ধ হ'ত; তাকে হিংসা করত মেয়েরা আর ভালবাসত পুরুষেরা। এক বড়লোক বন্ধু ছিল তার, একসঙ্গে পড়ত। সে কিন্তু কিছুদিন পরে আর তার সঙ্গে দেখা করেনি, কারণ তার বাড়ী গেলেই তার ঐশ্বর্য্যে এত মন খারাপ হত!

সারাদিন কাটত চোখের জলে, হতাশায়, অনুশোচনায় আর গ্লানিতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা বড় খাম হাতে ক'রে খুসিতে উপছে পড়তে পড়তে তার স্বামী বাড়ী এল—'কি এনেছি দেখ তোমার জন্যে?'

অধীর হয়ে খামটা ছিঁড়তেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একখানি ছাপা কার্ড। তাতে লেখা আছে:

'মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মহোদয় এবং মাদাম্ ঝর্জ রাপোঁনু আগামী ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার শিক্ষাসদনে যে ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে মঁশিয়ে এবং মাদাম্ লোয়াজেলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।'

স্বামী আশা করেছিল স্ত্রী খুসী হবে। স্ত্রী বিরক্তিভরে চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, 'ও নিয়ে আমি কি করব, শুনি?'

'তুমি ত কোথাও যাও না, তাই ভাবলুম এ রকম একটা অপূর্ব সুযোগে তুমি বুঝি খুসী হবে। কি কষ্টে যে যোগাড় করেছি এটা, সবাই পাবার চেষ্টা কচ্ছে কি না! নেমন্তন্ন হয়েছে খুব বেছে বেছে। আর কেরাণীরা প্রায় সবই বাদ পড়েছে। বড় বড় হোমরা-চোমরাদের সব দেখতে পাবে ওখানে।'

স্ত্রী বিরক্তিতে ধৈর্য হারিয়ে চড়া সুরেই উত্তর দিল, 'এই রকম একটা উৎসবে আমি কি প'রে যাব বলতে পার?'

ব্যাপারটা স্বামী ভেবে দেখে নি, তাই দ্বিধাভরে, 'কেন, যেটা প'রে তুমি থিয়েটারে যাও সেটা ত ভারী…' ব'লে মাঝপথেই থেমে গেল ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে দেখল বড় বড় দু ফোঁটা চোখের জল তার স্ত্রীর গাল বেয়ে পড়ছে। রুদ্ধশ্বাসে সে বলল, 'কি হয়েছে তোমার, এঁ্যা?'

দুঃসহ চেষ্টায় আবেগ সংযত ক'রে সিক্ত গাল মুছে স্থির স্বরে তার স্ত্রী বলল, 'কিছু না। আমার ত ঘাঘরা নেই, তাই উৎসবে যেতে পারব না। তোমার অফিসের কোন বন্ধুকে কার্ডটা দিয়ে দাও; তার স্ত্রীর প'রে যাবার মত পোষাক থাকতেও পারে।'

ভারী দুঃখু হল স্বামীর মনে!

'আচ্ছা, আমি এখনই ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, ম্যাথিলদ্। একটা বেশ ভাল ফ্রক্, বেশ সাদাসিধে অথচ পরে সব জায়গায় যাওয়া চলে—কত লাগবে বল ত?'

হিসাব করতে করতে ম্যাথিলদ্ চিন্তা করতে লাগল ঐ অতি-হিসাবী ক্ষুদ্র কেরাণীটাকে কত বেশী পর্যন্ত বললে ও না বলতে পারবে না। তারপর সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর দিল, 'ঠিক কি ক'রে বলি বল! তবে আড়াই শ' টাকা আন্দাজ হ'লে, আমি চালিয়ে নিতে পারি।'

লোয়াজেল একটু পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। যে টাকাটা তার স্ত্রী উল্লেখ করল ঠিক ঐ পরিমাণই সে জমিয়েছে, আসছে গ্রীষ্মে একটা বন্দুক কিনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নাঁতিয়েরের সমভূমিতে কোন এক রবিবাসরীয় পাখী শিকারে যাবে ব'লে। তবু সে উত্তর দিল, 'বেশ ত, আমি তোমাকে আড়াই শ' টাকাই দিচ্ছি। কিন্তু দেখ, জিনিষটা যেন ভাল হয়।'

* * * * *

উৎসবের দিন এগিয়ে এল। গাউন যদিও পরিপাটী হল তবু মাদাম্ লোয়াজেল মুখ ভারী ক'রেই রইল।

'ব্যাপার কি বল ত?' জিজ্ঞাসা করল তার স্বামী, 'এই তিনদিন তুমি যেন কি রকম হয়ে আছ।'

'দেখ', বলল তার স্ত্রী, 'ভারী বিরক্তি লাগছে আমার; একটাও গহনা

নেই—এমন কি একটা জড়োয়া সেফ্‌টি পিনও না। উৎসবে গেলে আমার মনে হবে আমি ভারী দরিদ্র। আচ্ছা, আমি না হয় নাই গেলাম।'

'কেন, টাটকা ফুল কয়েকটা প'রে নিও। এ বছর ত ফুলের ফ্যাশনই চলেছে। টাকা ছয়েকেই তুমি গোটা তিনেক চমৎকার গোলাপ পাবে।'

কথাটা মনে লাগল না ম্যাথিলদের: ধনী মেয়েদের ভাড়ের মধ্যে দরিদ্রের চালে যাওয়া বড় অপমানের।

'ভারী বোকা ত তুমি,' বলে উঠল তার স্বামী, 'তোমার বন্ধু মাদাম্ ফরেস্তিয়ের রয়েছে না? তার কাছে কিছু গয়না ধার চাও না ঐ দিনের জন্যে। সে তোমাকে না বলতে পারবে না।'

চীৎকার ক'রে উঠল আনন্দে ম্যাথিলদ্, 'সত্যি ত, আমার ত কখনও মনে পড়ে নি!'

পরের দিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে সে জ্ঞাপন করল তার অস্বস্তির কথা। পরিধেয়-মঞ্জুষা থেকে একটা বৃহৎ আভরণী বের ক'রে সেটি খুলে ধরল মাদাম্ ফরেস্তিয়ের বন্ধুর চোখের সামনে, 'পছন্দ হয়'? মাদাম্ লোয়াজেল দেখল তার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি ব্রেস্‌লেট, একটী মুক্তোর নেকলেস্, একটী মণি-খচিত সোণার ক্রুস। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটী একটি করে প'রে দেখল আর পড়ল দ্বিধায়—খুলে রাখতে যে ইচ্ছে করে না। আর কেবল সে জিজ্ঞাসা কচ্ছে বন্ধুকে, 'আর কিছু নেই?'

'কেন থাকবে না? তুমি নিজে দেখে নাও। আমি ত জানি না, কোন্‌টা তোমার পছন্দ হবে।'

অবশেষে মাদাম্ লোয়াজেল আবিষ্কার করল একটা কালো শাটিনের বাক্স, তার মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে একটী অপরূপ হীরের নেকলেস্।

অদম্য লোভে হৃৎস্পন্দন হল দ্রুততর। কম্পমান হাতে সেটি বের ক'রে নিজের উঁচু গাউনের উপর পরে উল্লাসে তাকিয়ে রইল আয়নায় নিজের প্রতিমূর্তির উপর। তারপর একান্ত সন্দেহে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা যদি দাও, তাহলে আমি আর কিছুই চাই না।'

'কেন দেব না? নিশ্চয় দেব।'

দুই হাত দিয়ে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধ'রে অদম্য আবেগে তাকে চুমু খেয়ে ম্যাথিলদ্ তার সম্পদ নিয়ে দিল ছুট।

* * * * *

উৎসব-রাত্রি—মাদাম্ লোয়াজেলের বিজয়োৎসবের রাত্রি যেন। হাসিতে, অনুকম্পায়, আর সেই অনুপম ঘাঘরায় আজ রাতে তার সৌন্দর্য অন্য সব মেয়েদের রূপকে ছাপিয়ে উছলে পড়ছে। মাথায় তার আনন্দের ঘূর্ণি। সব পুরুষই দেখছে তাকে, তার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছে, চাচ্ছে তার সঙ্গে পরিচয়। অফিসের অধস্তন কর্মচারীরা অনুমতি চাইল তার সঙ্গে নাচবার। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই শেষ পর্যন্ত না তাকিয়ে পারলেন না।

নিজের সার্থক সৌন্দর্যের গৌরবে যেন মাতাল হয়ে নিজেকে সে ঢেলে দিল নাচে। সে অঙ্গ সঞ্চালিত কচ্ছিল অপার্থিব আনন্দে বিভোর হয়ে—সেই আনন্দে মিশে গিয়েছিল তার সেই রাত্রিতে—পাওয়া যত আদর, যত অভ্যর্থনা; পুরুষের যত উদ্দীপ্ত কামনা—মেয়েমানুষের যত কিছু চাওয়া আর পাওয়ার পরিপূর্ণতা।

উৎসব থেকে নিজেকে ছিনিয়ে বের করে নিয়ে আসতে তার ভোর চারটের কাছাকাছি হয়ে গেল। মাঝরাত থেকেই তার স্বামী আরও জন তিনেক পত্নী-পরিত্যক্তের সঙ্গে একটা ছোট জনহীন বসবার ঘরে ব'সে ঢলছিল—স্ত্রীরা তখন উৎসবে মগ্ন।

বেরিয়ে আসতেই স্বামী তার গায়ের উপর একখানা গায়ের কাপড় জড়িয়ে দিল। তার সুন্দর নাচের পোষাকের উপর এই আটপৌরে কুশ্রী গায়ের কাপড়টা এমন বিসদৃশ ঠেকল যে ফারে-ঢাকা অন্যান্য মেয়েদের দৃষ্টি থেকে পালাবার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠল। লোয়াজেল তাকে ধ'রে রেখে বলল, 'দাঁড়াও একটা গাড়ী ডাকি আগে; নয় ত বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে।'

সে কথায় কান না দিয়েই ম্যাথিলদ্ সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়াল স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু গাড়ী একখানাও দেখা গেল না। বৃথাই তারা ডাকাডাকি করল দূর থেকে আবছা-দেখা গাড়ীগুলোকে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেপরোয়া হয়ে তারা হাঁটতে আরম্ভ করল সীন নদীর দিকে। শেষে জাহাজঘাটের কাছে সেই জাতীয় একখানা বৃদ্ধ গাড়ী পাওয়া গেল যাদের দেখা পারীতে মেলে মধ্যরাত্রির পরেই। দিনের আলোয় নিজেদের রূপে এই গাড়ীগুলো লজ্জা পায় বোধ হয়।

গাড়ীটা এসে থামল তাদের মার্টার স্ট্রীটের বাড়ীর দরজার সামনে। তারা বিমর্ষমুখে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। মাদাম্ লোয়াজেলের জীবনে উৎসব ফুরিয়ে গেল। তার স্বামী অবশ্য তখন ভাবছিল কাল সকাল দশটায় আফিস যেতে হ'বে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলে শেষবারের মত নিজের গৌরবদীপ্ত দেহের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করল সে। তাকিয়েই চীৎকার ক'রে উঠল, 'নেকলেস্ কোথায় গেল?'

জামাকাপড় আধ-ছাড়া অবস্থাতেই স্বামী জিজ্ঞাসা করল 'কি হল?'

ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে ম্যাথিলদ্ বলল, 'আ-আ-মি মাদাম্ ফরেস্তিয়ের নেকলেসটা হা-হারিয়ে ফেলেছি।'

ত্রাসে লাফিয়ে উঠল লোয়াজেল, 'নেকলেস্ হারিয়ে ফেলেছ ! বল কি ! বল কি ! অসম্ভব !'

গাউনের ভাঁজ, গায়ের কাপড়ের ভাঁজ, পকেট সবই খোঁজা হল। পাওয়া গেল না।

'যখন ওখান থেকে বেরিয়ে এলে তখন তোমার হার ছিল কি না ঠিক মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, যখন বেরিয়ে আসি তখন আমার গলাতেই ছিল।'

'কিন্তু রাস্তায় পড়লে ত আমরা শব্দ পেতুম। নিশ্চয় গাড়ীতে পড়েছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। তুমি নম্বরটা নিয়েছিলে গাড়ীর ?'

'না ত। তুমি নিয়েছিলে ?'

'আমি ত নিই নি।'

হতবুদ্ধি হয়ে এ ওর দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ; তারপর লোয়াজেল আবার কাপড় জামা পরল : 'যে পথটুকু পায়ে হেঁটে গিয়েছি আমরা, সেটুকু খুঁজে দেখে আসি একবার।'

সে বেরিয়ে গেল। ম্যাথিলদ্ না পারল বিছানায় শুতে, না পারল ভাবতে। আগুন পর্যন্ত না জ্বালিয়ে সন্ধ্যার সেই নাচের পোষাকেই সে একটা চেয়ারে ভেঙে পড়ল।

সাতটা আন্দাজ ফিরে এল তার স্বামী। নেকলেস্ পাওয়া গেল না।

যথারীতি পুলিশে খবর দেওয়া হল, খবরের কাগজে দেওয়া হ'ল পুরস্কারের বিজ্ঞাপন। যত ভাড়াটে গাড়ীর অফিস ছিল সব খোঁজ করল লোয়াজেল : যেখানেই আশার ক্ষীণ আভা দেখল সেখানেই ছুটল।

সারাদিন তার স্ত্রী অপেক্ষা করল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। দিশাহারা হয়ে গেল সে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

সন্ধ্যায় পাংশুমুখে ফিরে এল লোয়াজেল : বৃথা চেষ্টার পরিশ্রমে গাল ব'সে গিয়েছে তার। 'তোমার বন্ধুকে লিখে দাও' সে বলল, 'যে নেকলেসের একটা হীরে খুলে যাওয়ায় সারতে দিয়েছি। তাতে অন্তত একটু ভাববার সময় পাওয়া যাবে।' স্বামীর কথামত চিঠি লিখে দিল মাদাম্ লোয়াজেল।

* * * * *

সপ্তাহ খানেক গেল ; আর সব আশা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লোয়াজেলের বয়সও যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেল। সে বলল, 'নেকলেস্‌টা ফিরে ত দিতে হবে।'

যে মণিকারের নাম খোদাই করা ছিল বাক্সে তার দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে খাতাপত্র উল্টে বলল 'না মা, হারটা আমার এখান থেকে কেনা হয়নি। আমি খুব সম্ভব বাক্সটা দিয়েছিলুম।'

তারা এক মণিকারের দোকান থেকে আর এক মণিকারের দোকানে যায় আর মনে মনে মিলিয়ে দেখে হারান হারটার মত একটা হারও পাওয়া যায় কিনা। আর ক্লেশে, হতাশায় দুজনে মুষড়ে পড়ে।

খুঁজতে খুঁজতে প্যালে-রয়ালে একটি দোকানে ঠিক ঐ রকম একটা হীরের হার পাওয়া গেল। দাম পঁচিশ হাজার টাকা ; তবে মণিকার তেইশ হাজারে বিক্রী করতে রাজী হ'ল। তারা বলল, 'তিন দিনের মধ্যেই আমরা এটা কিনে নেব। তুমি এর মধ্যে আর কাউকে বিক্রী ক'র না। তবে এই ফেব্রুয়ারী শেষ হবার আগেই যদি হারান হারটা পাওয়া যায় তাহলে তোমাকে কিন্তু এটা আবার একুশ হাজারে কিনে নিতে হ'বে।' মণিকার স্বীকৃত হল।

লোয়াজেলের পৈতৃক টাকা ছিল হাজার বার। বাকীটা সে মনস্থ করল ধার করবে। কারও কাছে এক হাজার, কারও কাছে পাঁচশ',

কারও কাছে পঞ্চাশ, কারও কাছে তিরিশ—এমনি ক'রে কোন সম্ভব স্থানেই সে বাকী রাখল না: হ্যাণ্ডনোট কাটল, চড়া সুদেও দ্বিধা করল না। সর্বপ্রকারের মহাজনদের কাছেই বিকোল নিজের মাথা। নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ এমনি ক'রে ডুবিয়ে নিজের দস্তখৎ দিতে আর বাকী রাখল না কোথাও। শোধ করতে পারবে কিনা এ চিন্তাও এল না মনে। যে কালো দারিদ্র্য এল ব'লে, তার আনুষঙ্গিক দৈহিক, মানসিক কষ্টের চিন্তায় বিহ্বল হয়ে সে আনতে গেল হীরের হারটা—গিয়ে রাখল দোকানীর বাক্সর সামনে তেইশ হাজার টাকা।

মাদাম্ লোয়াজেল যখন হারটা ফিরিয়ে দিতে গেল তখন মাদাম্ ফরেস্তিয়ের বলল, 'আরও আগে তোমার ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল। আমারও ত পরবার দরকার হতে পারত।'

যাক্ ভাগ্যিস্ মাদাম্ ফরেস্তিয়ের বাক্সটা খুলল না। বদল ক'রে দিয়েছে বুঝতে পারলে কি মনে করত সে! কি বল্‌ত!

হয়ত মনে করত মাদাম্ লোয়াজেল চুরি করেছে।

*   *   *   *   *

চূড়ান্ত দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপের সঙ্গে এইবার পরিচয় হল মাদাম্ লোয়াজেলের। এই দারিদ্র্যকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করল সে, একটুও নতি স্বীকার করল না। এই প্রকাণ্ড ঋণ শোধ সে করবেই। ঝি-টাকে ছাড়িয়ে দিল। ফ্ল্যাটের বাসা ছেড়ে দিয়ে চ'লে এল খোলার বাসায়। গৃহস্থালির যত কাজ সব নিজেই সুরু করল করতে। স্নান করত রান্নাবান্নার পর। বাসন মেজে মেজে হাতের লালিম নখ ক্ষয়ে শাদা হয়ে গেল। ধোপার কাজ নিল নিজের হাতে—কাপড়-চোপড়, ঝাড়ন, পর্দা কাচা আর ইস্ত্রি করা। নিজের হাতে ক'রে রোজ সকালে বাড়ীর ময়লা রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসত, দূরে কল থেকে জল ধ'রে আনত আর পথে

দম নেবার জন্তে বারে বারে বসত। মজুর মেয়েদের মত পোষাকে কিনতে যেত শাকশব্জী, মশলাপাতি, মাছ-মাংস আর প্রতিটি আধলার জন্তে দরকষাকষি করত।

প্রতি মাসেই কোন না কোন হাত-চিঠির টাকা শোধ করতে হত আবার কোনওটার বা স্থদ দিয়ে সময় নিতে হত।

সন্ধ্যাবেলায় তার স্বামী এক ব্যবসাদারের খাতা লিখত আর রাত্রিতে লেখা নকল করত প্রতি পাতা এক আনা।

এই ধারায় চলল স্থদীর্ঘ দশ বছর। এই দশ বৎসর তারা কাটাল দেনার প্রতিটি পয়সা পর্যন্ত শোধ করতে। তারপরে এল ঋণমুক্তি।

মাদাম্ লোয়াজেলকে এখন দেখায় বুড়ীর মত। একেবারে ঠিক যাকে বলে দীনদরিদ্রের পরিবার হয়ে গিয়েছে সে—রূঢ়, কর্কশ, দেহে মনে মালিন্যের ছাপ। চুলগুলো ঝুলত অবহেলায়; গাউনের কুঁচি বিপর্যস্ত; হাতের তালু ঘাঁটায় লাল। গলার স্বরে আর সে কোমলতা নেই। এখন সে বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধোয়। কিন্তু মাঝে মাঝে, যখন তার স্বামী অফিসে থাকে তখন, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মন ফিরে যায় সেই সন্ধ্যায়, তার সেই বিজয়োন্মাদনার সন্ধ্যায়।

নেকলেস্‌টা না হারালে আজ তার অবস্থা কি হত? কে বলতে পারে? কেই বা জানে? কি অপরিচিত, কি বিচিত্র জীবনের এই অস্থির ঘটনাগুলো! কত ছোট্ট একটা জিনিষের উপর নির্ভর করে মানুষের বাঁচামরা!

সারা সপ্তাহের খাটুনির পর একটু খোলা বাতাসে বেড়ানর জন্তে এক রবিবার মাদাম্ লোয়াজেল ইলিসিয়ান্ ফিল্ডস্-এ ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করল ছেলে-কোলে একটা মেয়েকে। চিনতে তার দেরী হল না মাদাম্

ফরেস্তিয়েরকে—যৌবন এখনও তার তেমনিই আছে, তেমনিই অটুট আছে তার রূপ। মাদাম্ লোয়াজেল খেল তীব্র আবেগের দোলা। কথা বলবে ওর সঙ্গে? কেন বলবে না? দেনাটা যখন শোধ হয়ে গিয়েছে তখন সমস্ত ঘটনাটা বললেই বা ক্ষতি কি? এগিয়ে গেল সে, ডাকল, 'ভালো আছ ত', ঝাঁনে?'

বন্ধু তাকে চিনতে ত পারলই না বরং এই রকম একটা সাদা-মাটা মেয়ে তাকে এত পরিচিতের মত ডাকাতে বেশ একটু বিস্মিতই হ'ল। দ্বিধায় বলল, 'আমি ত আপনাকে চিনি না; আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন।'

'না। আমি ম্যাথিলদ্ লোয়াজেল।'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল বন্ধু, 'এ্যাঁ, তুমি সেই ম্যাথিলদ্। কী বদলে গিয়েছ তুমি!'

'তোমার সঙ্গে সেই যে শেষবার দেখা হয়েছিল তারপর থেকেই ভাঙল আমার কপাল। আর সে কপাল ভাঙলে তুমি।'

'আমি! কি বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ তুমি। শিক্ষাসদনে সেই উৎসবে প'রে যাবার জন্যে তুমি আমায় সেই হীরের নেকলেসটা ধার দিয়েছিলে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ। তারপর।'

'সেটা হারিয়ে যায়।'

'তার মানে? তুমি ত সেটা ফেরৎ দিয়েছিলে আমাকে।'

'যেটা তোমাকে ফেরৎ দিয়েছিলুম সেটা তোমার আগের নেকলেস্-টারই মত তবে অন্য একটা। আর গত দশ বছর ধ'রে সেই নেকলেসের দেনা শোধ করছিলুম। বুঝতেই পার, এক পয়সার সম্বল নেই যাদের তাদের পক্ষে এটা কি ব্যাপার। যাক্ গে—সে সব হয়ে বয়ে গিয়েছে। দেনাটা চুকে গিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।'

মাদাম্ ফরেস্তিয়ের কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে বলল, 'তুমি কি সত্যিই আমারটার বদলে একটা হীরের নেকলেস্ কিনে আমায় দিয়েছ!'

'হ্যাঁ, সত্যিই। কিন্তু তুমি ত ধরতে পারনি। দুটো ঠিক এক রকম।' মাদাম্ লোয়াজেল সরল অহঙ্কারের হাসি হাসল একান্ত সন্তোষে।

সহানুভূতিতে বিহ্বল হয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল মাদাম্ ফরেস্তিয়ের, 'ছি, ছি, এ তুমি কি করেছ ম্যাথিলদ্! আমার সেটা ত ছিল নকল হীরের নেকলেস্ঃ তার দাম তিনশ' টাকাও যে নয়।'
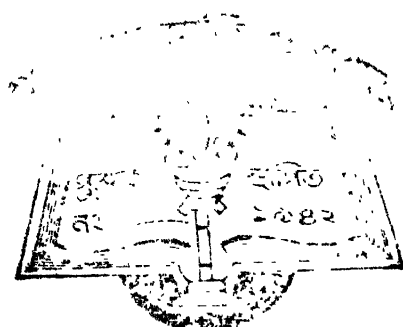
তার ছেলে

বাগানে নব বসন্তের ফুলের উচ্ছ্বাস। দুই পুরোনো বন্ধু অলস পদচারণায় রত—একজন রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য আর একজন রাষ্ট্রীয় সাহিত্য সভার সভ্য। ধীর, স্থির, যুক্তিশীল ব্যক্তি তাঁরা—যথেষ্ট নাম এবং প্রতিপত্তি আছে। দার্শনিক আলোচনা এ মুহূর্তে মন চায় না। তাই তাঁদের কথা হচ্ছিল রাজনীতি নিয়ে; তার মধ্যে এসে পড়ল তাঁদের সহকর্মীদের কথা: কেন না গল্প শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত না হলে জমে না। কথায় কথায় মনে জেগে উঠল অতীত স্মৃতি; কথা গেল থেমে। উষ্ণ, আলসে-করা বসন্তের বাতাসে পাশাপাশি চলতে লাগলেন দুই জনায়।

দেয়াল লতার একটা ঝাড় থেকে ভেসে এল এক ঝলক গন্ধ; নানা রঙের নানা গন্ধের ফুলের সৌরভ দূরে চলে গেল ভেসে। ল্যাবার্ণাম গাছ তার গুচ্ছ গুচ্ছ হলদে ফুল থেকে ছড়িয়ে দিল মধুগন্ধী, সোণার বরণ রেণুর মেঘ। তাদের উর্বর মিষ্টতা গায়ে এসে লাগে আতরের দোকানের গন্ধে-ভারী কণিকার মত। রোদের মত উজ্জ্বল গাছটা প্রেমিকের বদান্যতায় দূর দূরান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার জীবনদায়ী রেণুগুলো। পরিষৎ-সভ্য দাঁড়ালেন সেই প্রাণদায়ী নির্যাসের ঘ্রাণ নিতে।

'ভাবলে আশ্চর্য লাগে,' বললেন তিনি, 'এই মিষ্টি অদৃশ্য রেণুগুলো কত শত মাইল দূর পর্যন্ত প্রাণবিস্তার করবে, মেয়ে গাছগুলোর প্রাণ-শক্তিকে প্রতি তন্তুতে করে তুলবে আনন্দে মাতাল। তারপর জন্ম দেবে প্রাণসত্তার—আমাদেরই মত একটা জীবকোষ থেকে। আমাদেরই মত মরণশীল তারা, আমাদেরই মত তারা পথ ছেড়ে দেবে পরবর্তী বংশধরদের।'

বাতাসের প্রতি দোলনেই গন্ধ আসছে ল্যাবার্ণামের—উত্তেজক, উজ্জ্বল গন্ধ। সেইখানেই দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'নিজেরা যে কত সন্তানের জন্ম দিয়েছি তার হিসাব রাখা কি সোজা কথা না কি হে? এই দেখ না, এই গাছটা, বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রয়াসে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে; তারপরে একটু চিন্তাও কচ্ছে না তাদের সম্বন্ধে।'

সাহিত্যিক উত্তর দিলেন, 'আমরাও ত তাই করি ভায়া।'

'হ্যাঁ, অস্বীকার করি না সে কথা। মাঝে মাঝে আমরা ভাসিয়ে তাদের দিই, তবে জেনেশুনেই দিই। ঐখানেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।'

বন্ধু মাথা নেড়ে বললেন, 'উহুঁ', আমি তা বলিনি। এমন কে আছে, ভাই, যে অজান্তে বহু সন্তানের জন্ম দেয়নি; যাদের কথা সে জানেও না, যাদের নামের পাশে লেখা থাকে 'পিতা অজ্ঞাত', যাদের সে জন্ম দিয়েছে এই গাছটারই মত অনায়াসে। তুমিও জান না কত মেয়েকে জীবনে উপভোগ করেছ যেমন এই গাছটাও জানে না তার সন্তানের সংখ্যা। আঠার আর চল্লিশের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা আর এদিক ওদিক ধরলে, আমাদের প্রিয়াদের সংখ্যা কি দু-তিনশ' দাঁড়াবে না?

'এখন ধর বন্ধু, এতগুলো মিলনের একটাও কি সফল হয়নি এবং রাস্তার ভবঘুরেদের মধ্যে, কি জেলে, তোমার একটীও সন্তান নেই যে আমাদের মত ভদ্রলোকদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়, এমন কি খুনও করে? বলতে পার জোর ক'রে যে ঐ বেশ্যা-মেয়েটা, কি ঐ মায়ে-খেদানো রাঁধুনীটা তোমার মেয়ে নয়? তারপর ধর এতগুলি তথাকথিত সাধারণী রয়েছে—এদের প্রত্যেকেরই একটা কি দুটো ছেলে-মেয়ে আছে, যাদের বাপের ঠিক নেই, যারা জন্মেছে পাঁচ টাকা, সাত টাকার ক্ষণিক আলিঙ্গনের ফলে। সব ব্যবসারই লাভ ক্ষতি আছে ত। এ ব্যবসার ঐগুলোই হল ক্ষতি। কিন্তু ঐগুলোকে জন্ম দিল কারা?

আমি, তুমি, সকলেই, যাঁরা ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত। ভোজে, সন্ধ্যার আমোদে, দেহ যখন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে যেখানে সেখানে ছিনিয়ে নেয় এক মুহূর্ত্তের আনন্দ, তখন জন্মায় ওরা। চোর, ভবঘুরে, সমাজের যারাই অবাঞ্ছনীয়, তারাই আমাদের সন্তান। কিন্তু আমাদের এই না জানা ভালই হয়েছে। এই বদমায়েসগুলোরও আবার ছেলেপিলে হবে ত।'

'দেখ, আমার নিজের বিবেক একটা নীচ ঘটনায় ভারাক্রান্ত—সব সময়েই মন গ্লানিতে ভরে তোলে। আর আরও কষ্ট হয়, মন থেকে সন্দেহ কিছুতেই যায় না বলে। তোমাকে বলি শোন: বয়স তখন আমার পঁচিশ। এক বন্ধুর সঙ্গে ব্রিট্যানিতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। তিনি এখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। সপ্তাহ দুই তিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে দোয়ার্নেনেজে পৌঁছে সেখান থেকে সোজা চলে এলাম বাই দু ত্রেপাসের উপর রাজ্‌-এ। ঘুমোলাম একটা গাঁয়ে—তার নামের শেষের অক্ষর ফ। পরের দিন সকালে বন্ধুর এমন গা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করতে লাগল যে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলেন না। বিছানা কথাটা ব্যবহার করলাম অবশ্য অভ্যাসবশে; আসলে আমরা শুয়ে ছিলাম দু আঁটি খড়ের উপর। এ রকম জায়গায় থাকার কথা ভাবাই চলে না। ঠেলে ত ওঠালাম বন্ধুকে কোনও রকমে—বিকেল চারটে-পাঁচটা নাগাদ্‌ এলাম আউদিয়ানে। পরের দিন সকালে তিনি একটু ভাল থাকায় আবার বেরিয়ে পড়লাম। পথে তাঁর আবার শরীর এত খারাপ হ'ল যে অতিকষ্টে ত পঁৎ-লাব্বেতে এসে ঠেকলাম।'

'ভাগ্য ভাল; একটা সরাই পাওয়া গেল। বিছানায় শুলেন বন্ধু; কিঁপা থেকে ডাক্তার এল—দেখল খুব জ্বর, কিন্তু কেন তা বলতে পারল না।

'পঁং-লাব্বে গিয়েছ কখনও? যাও নি। ব্রিট্যানির ঐ অংশটা কেপ. দ্য রাজ থেকে মর্ধিহাঁ পর্যন্ত—সবচেয়ে পুরাকালীয়। সেকালের আচার-ব্যবহার আজ পর্যন্ত এমন ক'রে জীইয়ে রেখেছে যে মনে হয় পৃথিবীর ঐ কোণটুকুতে বুঝি কোন পরিবর্ত্তনের ছোঁওয়াই লাগেনি।

"আজ পর্যন্ত" বলছি তার কারণ এখনও প্রতি বছর আমি সেখানে যাই আমার সেই পাপের জন্তে।

'পুরানো একটা দুর্গের নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা হ্রদ। খাঁ খাঁ কচ্ছে চারিদিক। সেখানে আসে বুনো পাখী-পুকুলি। যে নদীটা এই হ্রদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে সেটা বেয়ে ষ্টিমার, নৌকো সহর পর্যন্ত আসে। রাস্তাগুলো সরু সরু তার দুদিকে মধ্যযুগীয় বাড়ী। পুরুষেরা এখনও মাথায় মস্ত টুপি পরে, লতাপাতা আঁকা ওয়েষ্ট-কোট পরে আর গায়ে পরে চারটে জ্যাকেট একটার উপর একটা: তার সব চেয়ে ছোটটা ঠিক কাঁধের নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছয় আর সবচেয়ে বড়টা একেবারে প্যান্টের হাঁটু পর্যন্ত। মেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট, সুশ্রী, সতেজ গায়ের রং। একটা কাপড়ের কাঁচুলি দিয়ে তাদের বুক এমন কষে বাঁধা, মনে হয় বর্ম প'রে আছে। ফলে তাদের দেহ একেবারে অনড়, উচ্ছসিত বুকের আকৃতির আদল পর্যন্ত পাওয়ার উপায় নেই। মাথায় তাদের অদ্ভুত পোষাক। কপালের দু পাশে চিত্রিত কাপড়ের টুকরো দিয়ে বাঁধা। সামনে থেকে চুল সব সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের উপর খোপনা করে বাঁধে, তার উপর পরে সোণা-রূপোর জরি দেওয়া বিচিত্র বনেট।

'সরাই-এর চাকরাণীটির বয়স আঠার-র বেশী হ'বে না। তার ফিকে নীল চোখের মধ্যে তারা দুটি যেন কালো ফোঁটা। সে প্রায়ই হাসত আর দেখাত তার ছোট ছোট সমান দাঁত; মনে হত ঐ দাঁত দিয়ে সে

পাথর ফুটো ক'রে দিতে পারে। ফ্রেঞ্চ জানত না সে একবর্ণও। তার অন্যান্য স্বজাতীয়ের মত সে ব্রেটনই বলত।

'যদিও রোগ ধরা পড়ল না তবু সেরেও উঠলেন না আমার বন্ধু। ডাক্তার খাটা-খাটুনি একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিল। তাঁর পাশেই আমার দিন কাটতে লাগল আর পরিচারিকাটি আসতই ঘরে কখনও আমার খাবার নিয়ে, কখনও রোগীর সরবৎ নিয়ে।

'আমি তাকে বিরক্ত করতাম, সে খুসি হত। কথা হত না আমাদের কেউ কারও ভাষা জানতাম না বলে। একদিন রাতে বন্ধুর পাশে বহুক্ষণ ব'সে থাকার পর যখন শুতে যাচ্ছি, দেখি চাকরাণীটিও শুতে যাচ্ছে। তার ঘর ঠিক আমারটার সামনেই। হঠাৎ, কি কচ্ছি না ভেবেই, অনেকটা মজা মারার জন্যেই হয়ত, আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম এবং তার বিস্ময় কাটবার আগেই তাকে আমার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দুয়ারে তালা দিয়ে দিলাম। ভীত, চকিত, হতবুদ্ধি হয়ে মেয়েটি তাকিয়ে রইল আমার দিকে: চীৎকার করতে পাচ্ছে না পাছে দুর্নাম রটে, পাছে মনিব তাড়িয়ে দেয়, এমন কি বাবাও হয়ত।

'আরম্ভ করেছিলাম খেলার ছলে। কিন্তু ঘরে তাকে দেখেই কামনায় অভিভূত হয়ে গেলাম। বহুক্ষণ ধ'রে নীরবে চলল আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুই কুস্তিগীরের মত, আমরা দুইজন দুজনাকে মোচড় দিয়ে, টেনে, হাতা-হাতি করে পরাভূত করবার চেষ্টায় ঘেমে হাঁপিয়ে উঠলাম। মেয়েটি বাধা দিয়েছিল বটে! গড়াতে গড়াতে হয়ত একটা টেবিল বা চেয়ারে লাগল ধাক্কা, হয়ত বা দেয়ালে, আর দুইজন দুইজনকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রেই কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলাম ভয়ে; শব্দে যদি কেউ জেগে ওঠে। তার-পরেই আবার সুরু হল সেই বেপরোয়া যুদ্ধ; আমি আক্রমণ করি আর

সে আত্মরক্ষা করে। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল মেঝের উপর —আর বাধা দিল না।

'ছাড়া পেতেই সে খিল খুলে ছুটে পালাল।

'পরের কয়দিন আর তার দেখাই পেতাম না। আমাকে সে কাছেই আসতে দিত না। কিন্তু বন্ধুর অসুখ সেরে যেতেই আমরা যেদিন যাব ঠিক করলাম তার আগের দিন রাতে মেয়েটি খালি পায়ে, শোবার পোষাক প'রেই মধ্যরাত্রে আমার পিছু পিছু আমার ঘরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের উপর, চেপে ধরল আমাকে তার বুকে। সারারাত্রি ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল আর আমায় আদর করল। আমার ভাষা সে জানে না। তবু তার ভালবাসা আর হতাশা আমাকে সে নিবেদন করল অমনি ক'রে।

'এক সপ্তাহের মধ্যেই ভুলে গেলাম এই অভিযানের কথা। চলার পথে এ রকম ঘটনা খুবই সাধারণ কি না। হোটেলের পরিচারিকারা পথিকদের এইভাবে আনন্দ দিয়েই থাকে।

'তিরিশ বছর ধ'রে তারপর আর পঁৎ-লাবে-ও যাই নি, এই ঘটনার কথাও ভাবি নি। একটা বই-এ ভাল ক'রে বাস্তবতার ছাপ দেবার জন্যে একবার বহুদিন পরে ১৮৭৬ সালে ব্রিট্যানির মধ্যে দিয়ে যেতে আবার সেইখানে এসে পড়লাম। সবই তেমনি আছে মনে হ'ল। সহরে ঢুকবার মুখে সেই পুরানো দুর্গ আর তার নীচেই সেই খাঁ-খাঁ-করা হ্রদ। সরাইটা রঙ্-চঙ্ লাগিয়ে আধুনিক করার চেষ্টা সত্ত্বেও, ঠিক তেমনিই আছে। ঢুকতেই দেখলাম দুটি ব্রেটন মেয়ে—সতেজ, সুন্দর—বছর আঠার ক'রে বয়স। তাদের বুক ঠিক তেমনি ক'রে কষে বাঁধা। তেমনি জরি দেওয়া বনেট মাথায়, তেমনি চিত্রিত কাপড়ের টুকরো কপালের দুই পাশে। সন্ধ্যা তখন ছ'টা। আমি খেতে বসতে সরাই-এর

কর্তা নিজেই তত্ত্বাবধান করতে এল। কুক্ষণে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম,

"এই সরাই-এর আগের কর্তাদের তুমি চেন। বছর তিরিশ আগে দশ দিন আমি এইখানে কাটিয়ে গিয়েছি। অনেক দিনের কথা।"

"আজ্ঞে তাঁরা, আমারই বাপ মা ছিলেন," সে উত্তর দিল।

'আমার থাকার কারণ তখন তাকে বললাম: কেমন ক'রে আমার এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন...! সে মাঝপথেই বলে উঠল,

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে। আমার তখন বয়স পনের কি ষোল। আপনি ঐ শেষের ঘরটায় থাকতেন আর আপনার বন্ধু থাকতেন ঐ রাস্তার ওপরের ঘরটাতে। ওটায় এখন আমি থাকি।"

'সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সেই ছোট্ট পরিচারিকাটির কথা আমার মনেই আসে নি। জিজ্ঞাসা করলাম,

"তোমার মনে আছে তোমার বাবার একটা সুন্দর ছোট্ট চাকরাণী ছিল। তার চোখ দুটি, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ছিল নীল আর দাঁত-গুলিও সুন্দর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু দিন পরে ছেলে হতে গিয়ে সে মারা যায়।" তারপর উঠোনে যে রোগা, খোঁড়া লোকটা সার খুঁড়ে তুলছিল তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ঐ ত তার ছেলে।"

আমি হেসে উঠলাম;

"মায়ের মত দেখতে ভাল নয় ত! ও বোধ হয় ওর বাপের মত হয়েছে।"

"তা হতে পারে," উত্তর দিল সে, "কিন্তু বাপটি যে কে তা জানা যায় নি। বাপের নাম না বলেই সে মারা যায়; আর কেউ জানতও না যে-

ওকে কেউ ভালবাসে। ওর অবস্থা শুনে সবাই এত অবাক হয়েছিল যে ওর কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় নি।"

'ভয়ে শিউরে উঠলাম ভীষণ বিপদের পূর্বাভাসে যেমন ক্ষণিক, অস্বস্তি আসে দেহে মনে—সেই রকম একটা অস্বস্তি। তাকিয়ে দেখলাম উঠোনের উপর লোকটাকে। ছোট পা-টাকে অতি কষ্টে টানতে টানতে দুটো বালতি ক'রে ঘোড়ার খাবার জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ছিন্নভিন্ন কাপড়-জামা, অত্যন্ত নোংরা। তার লম্বা, হল্‌দে চুলগুলো জট পাকিয়ে দড়ির মত ঝুলছে গালের উপর। সরাই-ওয়ালা বলল,

"কোন কাজের নয় লোকটা; শুধু দয়া ক'রে রাখা হয়েছে এখানে। অন্য জায়গায় থাকলে হয়ত ভাল হতে পারত। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছেন, না আছে বাপ মা, না আছে পয়সা কড়ি। আমার বাপ মা দয়া ক'রে স্থান দিয়েছিলেন, তাই না। না হলে ও আর তাঁদের কে?"

কোন উত্তর দিলাম না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুধু ঐ সহিস্‌টার কথাই বিভীষিকার মত মনে আসতে লাগল,

'ও যদি আমারই ছেলে হয়! আমিই কি জীবটার বাবা? ওর মাকে তাহলে আমিই মেরেছি। ধর, তাও ত সম্ভব।'

'ঠিক করলাম লোকটার সঙ্গে দেখা ক'রে ওর জন্মের ঠিক সময়টা জেনে নেব। মাস দুয়েকের ব্যবধান হলেই আমার সন্দেহ ঘুচবে। ডেকে পাঠালাম তাকে পরের দিন। কিন্তু মায়ের মতন সে-ও ফ্রেঞ্চ জানে না। এমন কি, মনে হল, লোকটা কিছুই বোঝে না—কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। একজন চাকরাণী আমার হয়ে তাকে বয়েস জিজ্ঞাসা করতে সে নির্বাক হয়ে রইল। তার গিঁঠোল, ঘৃণ্য হাতে টুপিটা ঘোরাতে ঘোরাতে নির্বোধের মত অর্থহীন হাসি হাসতে লাগল দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে। তবু চোখে এবং ঠোঁটের কোণে তার মায়ের হাসির আভাস পেলাম।

'সরাইওয়ালা এসে আমাকে এই অসুবিধার হাত থেকে বাঁচাল। সে খোঁজ ক'রে ওর জন্মের সময় নিয়ে এল। লোকটা জগতে এসেছে আমার হোটেল থেকে চ'লে যাওয়ার ঠিক আট মাস ছাব্বিশ দিন পরে। কারণ আমার ঠিক মনে আছে আমি লোরেঁতে পৌঁছই ১৫ই অগাস্ট। ওর জন্ম সময়ের পাশে লেখা আছে—পিতা "অজ্ঞাত", মা "ঝান্ কেরাডেক্।"

'হৃৎপিণ্ড আমার দপ্ দপ্ করতে লাগল; কথা আটকে গেল গলায়। তাকিয়ে রইলাম এই প্রাণীটার পানে। ওর লম্বা, হলদে চুলগুলো গোবর-গাদার খড়ের চেয়েও নোংরা।

'বুঝলাম আমার তাকানতে লোকটা অস্বস্তি বোধ করছে। সে মৃদু মৃদু হাসি বন্ধ ক'রে, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করল।

'ক্লিষ্ট, চিন্তিত হয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম নদীর ধারে। কিন্তু কি লাভ ভেবে? কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান অসম্ভব। বহুক্ষণ ধ'রে আমার পিতৃত্বের সপক্ষে, বিপক্ষে, ভাল মন্দ সব রকম যুক্তি দিয়েই বারে বারে ফিরে এলাম সেই ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় এবং শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসেই আরও আকুল হয়ে উঠলাম যে ঐ লোকটাই আমার ছেলে।

'খেতে না পেরে নিজের ঘরে চলে এলাম। ঘুম এল বহুক্ষণ পরে। আর যদিও বা এল, নিয়ে এল দুঃস্বপ্ন। আমি স্বপন দেখলাম ঐ ঘৃণ্য জাবটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে আর ডাকছে "বাবা"। তারপরেই ওটা কুকুর হয়ে গিয়ে কামড়াল আমার পায়ে। আমি যতই ছুটি, সেও আসে পিছন পিছন। কিন্তু ভেক্ ভেক্ না করে শুধু আমাকে গালাগালি দিতে থাকে। তারপর সে আমার সাহিত্য-সভার সহকর্মীদের

সামনে এসে উপস্থিত হল। সহকর্মীদের উপরই ভার পড়েছিল আমার পিতৃত্ব নির্ধারণ করবার। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন,

"কোন সন্দেহই নেই এ বিষয়ে। দেখছ না, দু'জনা একেবারে এক রকম দেখতে।"

'আমার সত্যিই মনে হল রাক্ষসটা আমার মতন দেখতে। মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল ধারণাটা—একটা অস্বাভাবিক ইচ্ছা নিয়ে জেগে উঠলাম—ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখব ওর চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে কি না।

'রবিবার—চার্চে যাওয়ার পথেই দেখা তার সঙ্গে। তার হাতে তিনটে টাকা দিতে দিতে ব্যাকুল চোখে তাকে নিরীক্ষণ করলাম। সেই রকম নির্বোধের মত হাসতে হাসতে, টাকাটা নিয়েই চঞ্চল হয়ে উঠে কি একটা কথা তো তো করতে করতে অর্ধেক উচ্চারণ ক'রেই সে স'রে পড়ল। নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল।

'সারাদিন তেমনি গ্লানিতেই কাটল। সন্ধ্যাবেলা সরাইওয়ালাকে ডেকে পাঠিয়ে অসীম সাবধানতা এবং কূটনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে জানালাম যে, এই অসহায়, দুঃখী জীবটির জন্যে আমি কিছু করতে চাই। সে উত্তর দিল, "কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন ওর জন্যে? ও কোন কাজেরই নয়। কিছু কত্তে গিয়ে আপনার শুধু কষ্টই সার হ'বে। ও আস্তাবল সাফ করা ছাড়া আর কিছুই পারে না। আমি সেই কাজই দিয়েছি ওকে। তার পরিবর্তে খেতে পায় আর ঘোড়াদের সঙ্গে ঘুমোয়। আর কিছুর ওর দরকার নেই। একটা পুরোনো পায়জামা যদি আপনার থাকে ওকে দিতে পারেন। সেটা অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যেই রদ্দি হয়ে যাবে।"

'আর বেশীদূর না গিয়ে, ভেবে দেখব ব'লে তাকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যার সময় একেবারে চুর মাতাল হয়ে ফিরল সেই হতভাগাটা, বাড়ীটায় প্রায় আগুন লাগাতে লাগাতে সাম্‌লে গেল এবং শেষ পর্যন্ত শাবল দিয়ে একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির তলেই কাদার মধ্যে শুয়ে নাক ডাকাতে ডাকাতে আমার সকালের বদান্যতাকে ধন্যবাদ দিল।

'পরের দিন সরাইওয়ালা আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন ওকে টাকা পয়সা না দিই। দু পয়সা পেলেই ও মদ খায় আর ব্রাণ্ডি খেলেই ও একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠে।

"আপনি যদি ওকে মেরে ফেলতে চান ত পয়সা দেবেন," বলল সে। পথচারীদের দেওয়া দুই এক পয়সা ছাড়া লোকটা কখনও টাকা পয়সার মুখ দেখেনি। আর পয়সা পেলেই ওর গন্তব্য হচ্ছে মদের দোকান।

'সামনে একটা বই রেখে পড়ার ভান ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ পশুটার দিকে তাকিয়ে এই শুধু ভাবলাম—ও আমার ছেলে, আমারই ছেলে—আর খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম আমার দেহের সঙ্গে কোন মিল। অবশেষে মনে হ'ল কপালের রেখাগুলো আর নাকের নীচেটা যেন আমার মত। তারপরই বেশ বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গে তার মিল—যেটা কাপড়চোপড়ে আর ঐ ঘৃণ্য চুলের গোছায় এতক্ষণ ঢাকা ছিল।

'আর বেশীদিন থাকলেই লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। তাই সরাইওয়ালার হাতে ঐ সহিসটার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে বোঝা-ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম। গত ছ'বছর ধরে শুধু এই ভীতিপ্রদ অনিশ্চয়তা, এই দুর্বিষহ সমস্যা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। প্রতি বছর দুর্নিরোধ্য আবেগে আমি ছুটে যাই পঁং-লাবেতে। প্রতি বছর গোবর গাদার উপর টলতে টলতে চলা সেই পশুটাকে দেখার কষ্ট আমাকে

ভোগ করতে হয়। কল্পনা করতে হয় যে সে আমার মত দেখতে, আর বৃথাই চেষ্টা করি তাকে কিছু সাহায্য করবার। আর প্রতি বছরই ফিরে আসি আরও ক্লিষ্ট আরও লাঞ্ছিত, আরও সন্দিগ্ধ হয়ে।

'তাকে আমি লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মাথায় তার কিছুই নেই। আমি চেষ্টা করেছি তার জীবনকে একটু সহজ করবার কিন্তু প্রতিবারই সমস্ত পয়সা খরচ ক'রে সে মাতাল হয়েছে এবং নূতন পোষাক বিক্রী করে ব্র্যাণ্ডি কিনতে শিখেছে। আমি চেষ্টা করেছি যাতে সরাই-ওয়ালা ওর প্রতি একটু সদয় হয়; তাকে ঘুষও দিয়েছি। অবশেষে সরাই-ওয়ালা আমার এই চেষ্টায় বিস্মিত হয়ে বলল, "আপনি ওর জন্যে যা-ই করবেন তাতেই ওর খারাপ হ'বে। বন্দীর মত থাকা ছাড়া ওর উপায় নেই। ওর কোন কাজ না থাকলে কি মন ভালো থাকলে মাথায় ওর কুবুদ্ধি জাগে। আপনি যদি কিছু সৎকাজ করতে চান, আরও ত অনেক অসহায় ছেলেপিলে আছে, তাদের জন্যে কিছু করুন। তাতে আপনার শ্রম সফল হবে।"

'কি উত্তর আমি দেব। আমার সন্দেহ ঘুণাক্ষরে যদি ও হতভাগাটা জানতে পারে ত ভয় দেখিয়ে আমায় সর্বনাশ করবার মত, অন্ততঃ আমাকে শুষবার মত দুর্বুদ্ধির ওর অভাব হবে না। স্বপ্নে যেমন "বাবা" বলে ডেকেছিল তেমনি ক'রে আমার পিছনে ডাকতে ডাকতে চলবে। আর নিজের মনে মনে কেবল এই কথা বলি যে আমি ওর মাকে মেরেছি, এবং ঐ যে বাড়-হীন কীটটা গোবরের গাদায় জন্মে বেড়ে উঠেছে ও-ও শুধু আমারই জন্যে মাটি হল। অন্য জায়গায় মানুষ হ'লে ও কি অন্য লোকের মত হ'ত না?

'কল্পনাই করতে পারবে না তুমি কি অদ্ভুত, অসহ্য, অবর্ণনীয় মনোভাব হয় আমার, যখন ওর দিকে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি ওর

জন্মের জন্তে দায়ী আমি, ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে বাপ-ছেলের সম্বন্ধ, হাজারো রকমে রক্তে, মাংসে, এমন কি আমার নানারকম রোগে পর্যন্ত ওর উত্তরাধিকার। ওর কামনা বাসনার বেগও আমারই মত।

'যতই ওকে দেখি ততই ওর দিকে তাকিয়ে দেখবার অস্বাস্থ্যকর ইচ্ছার তৃপ্তি হয় না আমার। আর দেখলেই হয় অসহ্য কষ্ট। পঁৎ-লাবের হোটেলে জানালা দিয়ে তাকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখি সার খুঁড়ে বের কচ্ছে আর গাড়ী বোঝাই কচ্ছে, আর মনে মনে বলি,

'ও আমার ছেলে।'

মাঝে মাঝে আমার অদম্য ইচ্ছা হয় ওকে বুকে চেপে ধরবার। কিন্তু আমি কখনও তার নোংরা হাতটাও ছুঁই নি।'

সাহিত্য-সভার সভ্য চুপ করলেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য, তাঁর বন্ধু, আপন মনেই বললেন,

'হ্যাঁ, তা ঠিক। পিতৃহীন ছেলেপিলেগুলোর জন্তে আমাদের আরও বেশী কিছু করা উচিত।'

একটা বাতাসের ঢেউয়ে ল্যাবার্ণামের হলদে ফুলের গুচ্ছ থেকে সুগন্ধি রেণুর মেঘ ভেসে এসে দুই বৃদ্ধকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল; তাঁরা গভীর ক'রে বারে বারে নিঃশ্বাস নিলেন।

রাষ্ট্রীয় সভ্য বললেন, 'যাই বল না কেন, ঐ রকম সন্তানের জন্ম দিলেও পঁচিশ বছর বয়েসটা ভাল।'

জ্যোৎস্না

অ্যাবে মারিনঁার নাম 'মারামারি' রাখা কিছু অন্যায় হয় নি। লম্বা, রোগা, বিশ্বাসে একেবারে অন্ধ। উদ্যম তাঁর কখনও কমত না; বিবেকে আসত না কোনও শিথিলতা। তাঁর বিশ্বাস ছিল নিষ্কম্প দীপশিখার মত। ঈশ্বরের সত্তা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এমন কি তাঁর সৃষ্টির ছক-টি পর্যন্ত অ্যাবে-র জানা।

তাঁর সরকারী বাড়ীর বাগানটিতে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই একটা কথা তাঁর মনে আসত: 'এই, এই কাজের পিছনে ভগবানের উদ্দেশ্যটা কি?'

নিজেকে মনে মনে ভগবান কল্পনা ক'রে যুক্তি দিয়ে দিয়ে, যুক্তি দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যটি বার ক'রে তবে ছাড়তেন। মিনমিনে ভক্তদের মত লুটিয়ে প'ড়ে আত্মনিবেদন ক'রে তাঁর কোন দিনই বলবার দরকার হ'ত না 'অজ্ঞেয় তোমার রহস্য, হে ভগবান।' তিনি বরং মনে করতেন যে ভক্ত হিসাবে প্রভুর কাজের যুক্তিগুলো তাঁর জানবার অধিকার আছে; জানতে না পারলেও অন্তত অনুমান তিনি করতে পারতেন। জগৎ ব্যাপারের সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা স্বতঃই প্রতিভাত হত তাঁর চোখে—এর কিছুটি অন্য রকম হবার উপায় নেই এমন অপূর্ব! প্রত্যেক প্রশ্নেরই জবাব মিলছে: প্রভাত হয় কেন? জাগাবার জন্যে। উদার সূর্যের আলো শস্য পাকাবার জন্যে। রাত্রি আসে ঘুমোবার জন্যে আর অন্ধকারের প্রয়োজন গভীর নিদ্রার জন্যে। দেখ, কৃষি-কাজের জন্যে যখন যে ঋতুটি দরকার তখন সেইটি আসছে। তাঁর পুরুতের মনে এ সন্দেহ একবারও উদয় হয় নি যে প্রকৃতির কাজে

উদ্দেশ্য আরোপ করা চলে না এবং বাঁচবার প্রয়োজনেই মানুষ যুগ, জলবায়ু এবং বস্তুর যথেচ্ছাচারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

মেয়েদের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ঘৃণা এবং অবজ্ঞা। খ্রীষ্টের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি বলতেন 'নারী, তোমাকে আমার কি প্রয়োজন?' তিনি আরও ভাবতেন, 'ভগবান্ নিজেও নিশ্চয়ই এই নারী সৃষ্টি ক'রে তেমন আনন্দ পান নি।'

নারী তাঁর কাছে সত্যিই, কবির কথায় বলতে গেলে, 'শিশু হলেও, শিশুর মত সরল সে ত নয়।' সে প্রলুব্ধ করে পুরুষকে। প্রথম পুরুষকে সে-ই প্রলুব্ধ ক'রে বিপথে এনেছে। আজও সে সেই অভিশপ্ত কাজেই লিপ্ত। কাজের বাধা ঘটায় কেবল অথচ বুঝবার উপায় নেই তাকে। দুর্বল সে অথচ তার কাছে গেলেই বিপদ। তার ঘৃণ্য দেহের চেয়েও বেশী ঘৃণার্হ তার তৃপ্তিহীন ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর যদিও কোন ভয় নেই তবু কম্পমান ভালোবাসার ক্ষুধা নিয়ে সমান তারা তাঁর চারিপাশে ঘুরছে দেখে তাঁর রাগ হত। তাঁর মনে হ'ত মেয়েদের ভগবান সৃষ্টি করছেন শুধু প্রলোভন হিসেবে, পুরুষকে পরীক্ষা করবার জন্যে। তাই তার কাছে যেতে হলে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়েই যেতে হবে এবং প্রলোভনের মতই তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। সত্যিই, ফাঁদই সে বটে! চুমু খেয়ে, আদর ক'রে ফাঁদে ফেলে! ব্রত, আচার ক'রে নির্বিষ হয়ে যে সব মেয়ে তাপসী হয়ে আছে চার্চে তাদেরই তিনি একটু সহ্য করতে পারতেন, তবু ব্যবহারে রূঢ়তা তাঁর থাকতই কারণ, এ কথা ত তাঁর কাছে লুকোনো যাবে না যে ওদের বিনীত, দাসী হৃদয়ের গোপন অন্ধকারে দুর্মর সেই ভালোবাসা, তিনি যে তাপস, তাঁর দিকে পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ভক্তি-উছলে-পড়া ওদের চোখে যে দীপ্তি ফুটে ওঠে সে রকম দীপ্তি ত তাপসদের চোখে ফোটে না। যীশুর

প্রতি প্রেমে যখন তারা বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য তখন সেখানেও ওদের নারী-হৃদয় প্রবেশ করে আর অ্যাবের রাগ হয় তাদের প্রেমের এই দেহ-সর্বস্বতা দেখে। তাদের বিনয়, তাদের নামানো চোখ, তাঁর বকুনিতে তাদের আত্মনিবেদনের চোখের জলে—সব কিছুতে তিনি দেখতেন ঐ ঘৃণ্য প্রবৃত্তির প্রকাশ। তাদের আশ্রম থেকে বেরিয়েই তিনি পোষাকটা একবার ঝেড়ে নিয়েই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন, যেন কোন বিপদের হাত থেকে পালাচ্ছেন।

তাঁর এক ভগ্নী ছিল। সে থাকত কাছেই একটা বাড়ীতে তার মায়ের সঙ্গে। অ্যাবে ঠিক করেছেন তাকে তাপসী করবেন। মেয়েটি দেখতে বেশ, বোকা আর মজা-মারা। অ্যাবে যখন তাকে বক্তৃতা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করতেন তখন সে হাসত আর তিনি বিরক্ত হ'লে সে দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর করত। প্রকৃতিবশে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলেও তাঁর মনটা কেমন স্নিগ্ধ হয়ে আসত আর মনের গভীর তলদেশে সুপ্ত পিতৃস্নেহ উঠত জেগে। মাঠের পথে তাকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই তিনি নিজের উপলব্ধ ভগবান সম্বন্ধে আলাপ করতেন। কিন্তু তার কান নেই সেদিকে। সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, কিংবা সবুজ ঘাসের দিকে কিংবা ঐ ফুলগুলোর দিকে—চোখে তার দীপ্ত প্রাণের উল্লাস। হঠাৎ ছুটে যায় সে প্রজাপতি ধরবার জন্যে আর ধরে এনে ব'লে ওঠে,

'দেখ, দেখ মামা, কি সুন্দর। আমি চুমু খাব একে।'

এই পোকা মাকড় কি লাইলাকের কুঁড়ি চুমু খাওয়ার ইচ্ছার ভেতর, ঠাকুরমশাই বিরক্ত, ব্যাহত, ক্ষুব্ধ হয়ে দেখেন, মেয়েদের হৃদয়ের সেই দুরপনেয়, জীবন্ত কামনা।

একদিন তাঁর সহকারীর স্ত্রী, যে তাঁর গৃহস্থালির কাজ করত, সে

অতি সাবধানে তাঁকে জানিয়ে দিল যে তাঁর ভাগ্নী প্রেমে পড়েছে। অ্যাবে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। বিস্ময়ে, এক মুখ সাবান নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। ভাববার, কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে এলে তিনি বললেন, 'তুমি ভুল করেছ, মেলানি।'

বুকে হাত দিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল,

'ভুল ক'রে থাকি ত কি বলেছি! আপনার বোন শুয়ে পড়লেই ভাগ্নীটি রোজ রাতে গিয়ে উপস্থিত হয় নদীর ধারে। রাত্তির দশটা থেকে বারটার মধ্যে আপনি নিজেই গিয়ে দেখবেন একদিন।'

থুতনি চাঁচা ছেড়ে তিনি বেগে একবার ঘরের এদিক একবার ওদিক করতে লাগলেন। গভীর কিছু চিন্তা করতে হলে তিনি এমনি করেন। বাধাপ্রাপ্ত ক্ষৌরকার্য আবার আরম্ভ করেই নাক থেকে কান পর্যন্ত কচাকচ্ তিনবার কেটে ফেললেন। রেগে আগুন হয়ে একটা কথাও বললেন না সারাদিন। ধর্মযাজক হিসেবে অপরাজেয় প্রেমের হাতে তাঁর পরাজয় হয়েছে; তার উপর একটা দুধের মেয়ে কি না তাঁর মত নৈষ্ঠিককে নিয়ে, নিজের অভিভাবককে নিয়ে মজা মারল, তাঁকে ঠকাল! আর বলা নেই, কওয়া নেই, একটা মত নেওয়া নেই—সটান কি না বলে বসল—এই আমার স্বামী।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বই পড়ার চেষ্টা করলেন; মাথায় কিছুই ঢুকল না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চলেছে রাগ। দশটা বাজতেই, যে ওকের লাঠিটা নিয়ে রাতে রোগীর বাড়ী যান, সেই স্থূল দণ্ডটি নিলেন হাতে। ভীষণ হেসে, শক্ত হাতে লাঠিটা ধ'রে ভীতিপ্রদ ক্ষিপ্রতায় বন্ বন্ ক'রে দুবার ঘুরিয়ে নিলেন। পরেই হঠাৎ লাঠিটা শূন্যে তুলে, দাঁতে দাঁতে ঘষে একটা চেয়ারের উপর এমন জোরে মারলেন যে চেয়ারের পিঠটা ভেঙে মেঝেতে প'ড়ে গেল।

বাইরে যাবার জন্যে দুয়োর খুলেই থমকে দাঁড়ালেন! বাঁধভাঙা জ্যোৎস্না উছলে পড়ছে আকাশে। এমন ক'রে চাঁদ অল্পই হাসে! অ্যাবে-র কল্পনা ছিল মধ্যযুগীয় ঋষি-কবিদের মতই উদার। এই শান্ত, সীমাহীন রাত্রির দীপ্তিস্নিগ্ধ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মৃদু কিরণের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট বাগানটিতে। ফলের গাছগুলির পুষ্পিত, সরু শাখাগুলি সবল, স্পষ্ট ছায়া ফেলেছে পথের উপর। দেয়ালের গায়ে হানি-সাকল্ গাছটা সৌরভ বিছিয়ে দিল স্বচ্ছ, মেদুর রাত্রির আকাশে— মনে হল ওর যেন প্রাণ আছে।

গভীর ক'রে জ্যোৎস্নার আর সৌরভের মদ পান করলেন তিনি মাতালের মত। চলার বেগ হল শ্লথ। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ভাগ্নীর চিন্তা তখন মন থেকে প্রায় লুপ্ত। বাড়ী ছেড়েই চোখে পড়ল উন্মুক্ত প্রান্তর—শান্ত, সমাহিত, মোহময় রাত্রি তাঁকে যেন জ্যোৎস্না ঢেলে আদর কচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে ব্যাং—থামবার নাম নেই। চাঁদের আলোর প্রলোভন, দূর দুরান্তরের বুলবুলের ডাকের সঙ্গে মিশে যে মাদকতা সৃষ্টি করেছে তাতে মন হয়ে ওঠে স্বপ্নাতুর, ভাবে, এই লঘু গানের রেশের সঙ্গে মিলে যায় একটী চুম্বন।

আবার হাঁটতে সুরু করতেই অ্যাবের সেই স্থির প্রতিজ্ঞা কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল। মনে হল, দুর্বল হয়ে পড়েছেন যেন হঠাৎ। ইচ্ছে হল সেইখানেই ব'সে পড়েন আর চারিদিক দেখতে দেখতে ভগবানকে, আর তাঁর সৃষ্টিকে নমস্কার জানান।

ঐ দূরে নদীর ধারে স্রোতের সঙ্গেই এঁকে বেঁকে চলেছে পপ্‌লারের সারি। নদীর ওপর জ্যোৎস্নায় চপ্‌চপে হয়ে দুলছে বাষ্পের আস্তরণ— ভেসে ভেসে চলেছে। আবার থামলেন ব্রহ্মচারী। ক্রমবর্ধমান আবেগে

হৃদয় হয়ে উঠল ভারী। সন্দেহ এল মনে—একটা অস্বস্তি। প্রশ্ন এল, যেমন তাঁর মনে আসে, 'কেন এই সবের সৃষ্টি? রাত্রি ত অচেতন ঘুমের জন্যে, সব কিছু ভুলে যাবার জন্যে। কেন তবে এই রাত্রিকে ভগবান, প্রভাতের চেয়ে, সূর্যাস্তের চেয়েও, সুন্দর করলেন? কেনই বা ধীরগতি ঐ জ্যোতিষ্কটি, এত মনোরম, সূর্যের চেয়েও কবিতাময়, এত শান্ত, যার কেবল দিনের আলোয় অপ্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম জিনিষের উপর কিরণপাত করবার কথা, কেন সে সারা রাতের অন্ধকারকে আলোয় মাতিয়ে তুলল? কেনই বা ঐ পাখী ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জে ব'সে জেগে জেগে অদ্ভুত গান গাচ্ছে? এই স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন কেন নামিয়ে দেওয়া পৃথিবীর উপর? সব মানুষ ত ঘুমিয়েছিল; তবে কেন তাদের জন্যে এই সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি? কে দেখবে এই অপরূপ দৃশ্য! কেই বা উপভোগ করবে অকৃপণ হয়ে ছড়িয়ে দেওয়া এই কবিতার ঐশ্বর্য?'

কোন উত্তর পেলেন না ব্রহ্মচারী। হঠাৎ চোখে পড়ল মাঠের ধার দিয়ে হেঁটে আসছে ছায়ামূর্ত্তি দুটি তরুণ তরুণী, পাশাপাশি। তাদের মাথার উপর গাছের শাখাপ্রশাখায় আলো-ছায়ার তোরণ রচা।

দুজনের মধ্যে ছেলেটিই বেশী লম্বা। তার হাত ছিল সঙ্গিনীর কাঁধের উপর; মাঝে মাঝে সে চুমো খাচ্ছিল তার কপোলে। এদের দুজনার মধ্যে সারা প্রকৃতি যেন ভাষা পেল; এদের পেছনে তৈরী করল স্বর্গীয় পটভূমিকা। তারা দুজনে যেন মিশে গিয়েছিল এক সত্তায়। তারা যত এগিয়ে আসে ততই ব্রহ্মচারীর মনে হয় এই শান্ত, নিস্তব্ধ রাত্রি এদের জন্যেই তৈরী হয়েছিল; তাঁর প্রভু এতক্ষণ যেন বলছিলেন, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যে, এরাই হল এই রাত্রির জীবন্ত অর্থ।

ব্রহ্মচারীর হৃৎপিণ্ড দপ্ দপ্ কচ্ছে আবেগে। সব যেন কি রকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। যা তিনি দেখলেন তা নিশ্চয়ই পুরাণের কোন

স্বর্গীয় দৃশ্য—নিশ্চয়ই আদম্ আর ইভ্ সৃষ্টির মহা-নাটকে ঈশ্বরের মহান ইচ্ছা পরিপূর্ণ কচ্ছে। ব্রহ্মচারীর কাণে বাজতে লাগল অমরাবতীর মিলনের গান—প্রাণ যেখানে বাধা পায় না, হৃদয়ের ডাক যেখানে হৃদয়ে পৌছায়, উত্তুঙ্গ প্রেম যেখানে খুঁজে পায় স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা।

'হয়ত', ভাবলেন তিনি, 'মানুষের ভালোবাসার উপর স্বর্গীয় আবরণ দেবার জন্তেই ভগবান এই রকম রাত্রির সৃষ্টি করেছেন'। হাত ধরাধরি ক'রে দুজনে যত এগিয়ে আসে ব্রহ্মচারী তত পিছিয়ে আসেন। ঐ ত তাঁর ভাগ্নী! কিন্তু এ কি বিপদ? তিনি কি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন না কি? এমনি আলোয় যদি তিনি ঢেকে থাকেন মানুষের ভালোবাসা, সে কি ভালোবাসা বারণ করার জন্তে?

বিপর্যস্ত, যেন কোন দেবমন্দিরে তিনি অনধিকার প্রবেশ করেছেন এমনি লজ্জিত হয়ে, ব্রহ্মচারী এক রকম ছুটে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।
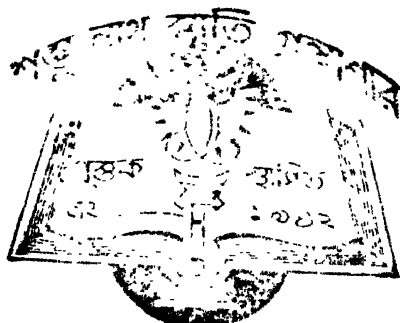
বসন্তে

প্রথম বসন্তের আলোয় দিনগুলি যখন উজ্জ্বল, পৃথিবী ঘুম থেকে উঠে সবুজ ঘাসের পোষাক পরছে, গালে আঙুল ছুঁইয়ে আদর কচ্ছে মলয় বাতাস—বুক ভরে দিয়ে হৃদয়ে গিয়ে দিচ্ছে দোলা তখন অজানা আনন্দের আশা কোথা থেকে জেগে ওঠে মনে, ইচ্ছে করে হাঁটার বদলে ছুটে চলি, বেরিয়ে পড়ি অভিযানে বসন্তের বাতাসে ভরপুর হয়ে। তীব্র শীতের পর ফাগুনের স্পর্শে মন আমার হয়ে উঠল উদ্দাম, শিরায়, যাকে বলে, উষ্ণ রক্তের স্রোত বইল। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়েই দেখলাম পাশের বাড়ীগুলোর মাথার উপর ঘন নীল আকাশ, রৌদ্রে ভরা। জানালার কাছে ক্যানারী পাখীগুলো তারস্বরে কিচ্‌মিচ্‌ করতে সুরু করল। বাড়ীর প্রতি তলা থেকেই আসছে ঝি-দের কাজের ফাঁকে গানের আওয়াজ। রাস্তা থেকে আসা আনন্দ কোলাহল কানে আনছে স্বাগত সম্ভাষণ। কোথায় যাচ্ছি ঠিক না করে খুশ্‌ মেজাজে বেরিয়ে পড়লাম।

উষ্ণ, উচ্ছল বসন্ত ফিরে এসেছে; ফিরে এসেছে লোকের মুখের হাসি: বাতাসে আনন্দ। মনে হল সারা সহরটাই প্রেমার্ত বাতাসের স্পর্শে নিমীলিত। পথ দিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়েরা সকালের পোষাক প'রে, দৃষ্টিতে লুকোনো স্নেহ, হাত পা নড়ার মধ্যেও একটা অলস শোভা। হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। আপন মনেই চললাম সীনের ধারে। সুরীনে ষ্টীমার যাচ্ছে দেখে মনে অদম্য ইচ্ছা হ'ল বন দেখার।

ষ্টীমারে ভিড়। প্রথম আলোর আকর্ষণ কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সবাই ন'ড়ে চ'ড়ে উঠেছে, যাচ্ছে আসছে, কথা বলছে আশে পাশে

লোকের সঙ্গে আমার পাশে ছিল একটা খাটো গোছের মেয়ে—দেখে মনে হ'ল কাজ ক'রে জীবিকা-অর্জ্জন করে; কিন্তু খাঁটি পারীর মেয়ের স্বাভাবিক সুষমা তার মুখে। মাথাটি ছোট্ট সুন্দর। তার কোঁকড়ানো সোণার বরণ রোদ্দুরে-বোনা চুল কাণে, কপালে, ঢেউ খেলিয়ে ঘাড়ে নেমে এসে একটা যেন পালকের থোপনা হয়েছে, এত নরম আর চিকণ যে স্পষ্ট দেখাই যায় না অথচ চুমোতে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এমন স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলুম তার দিকে যে মেয়েটি আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। চোখ নামিয়ে নিল তবু মুখের কোণে কাঁপছে ক্ষীণ হাসির ইঙ্গিত। সেই হাসিতে দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলোয় চিক্‌মিক্ করা তার ওষ্ঠের উপর রোমরাজি।

নদীর ধারা বিস্তৃত হতে হতে চলেছে। উষ্ণ শান্তি বাতাসে, চারিদিক প্রাণবান। আমার প্রতিবেশিনী চোখ তুলতেই দেখা হল আমার চোখের সঙ্গে। এবার সে ইচ্ছে ক'রে হাসল। হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়। তার চকিত চাহনিতে সন্ধান পাই অজানা রহস্যের। মনে হল ঐ সুগভীর চাহনিতে, ভালোবাসার সবটুকু আনন্দ, আমাদের সব স্বপন-ভরা কবিতা, আমাদের চিরকালের খোঁজা শান্তি নিহিত আছে। মন উন্মাদ হয়ে উঠল ওকে দু হাতে ক'রে ধ'রে কোন নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে কাণে কাণে গান গেয়ে বলতে আমার প্রেমের কথা।

তার সঙ্গে কথা বলব বলব কচ্ছি, কাঁধে হাত দিয়ে কে ডাকল। বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলুম একটা সাদাসিধে লোক, না যুবো না বুড়ো, অতি বিষণ্ণমুখে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

সে আরম্ভ করল, "আমার দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে।" আমার ক্ষোভ লক্ষ্য ক'রে বলল, 'বিশেষ দরকারী কথা।"

উঠে তার পিছু পিছু ষ্টীমারের অপর প্রান্তে গেলাম।

সে বলতে লাগল, আচ্ছা ম'শায়, শীতের সঙ্গে সঙ্গে জল-বৃষ্টি, তুষার শুরু হলেই ডাক্তারেরা বলতে থাকেন, গরম জামা কাপড় পর, না হলে ঠাণ্ডা লাগবে, ব্রঙ্কাইটিস্ হবে, প্লুরিসি হ'বে। আর আপনারা গরম জামা কাপড় মোজা প'রে সাবধান হ'তে কসুর করেন না। তবু মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখে দু-এক মাস শয্যাশায়ী হন। কিন্তু ফলে-ফুলে যখন বসন্ত আসে, মিঠে প্রাণঘাতী মাঠ-ঘাটের গন্ধে ভরা বাতাস বয়, মনে জাগে অর্থহীন অস্থিরতা আর অদ্ভুত আবেগ, তখন ত কাউকে বলতে শুনি নি, "সাবধান! প্রেম এসেছে! আনাচে-কানাচে সব জায়গায় ওৎ পেতে বসে আছে তার অস্ত্র-শস্ত্র শান দিয়ে, ছলা-কলা তৈরী ক'রে। সাবধান! এ জিনিষ প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিসের চেয়েও খারাপ। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই, একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেবে।" লোকে যেমন বাড়ীর দুয়োরে লেখা মেরে দেয়, "হেলান দিবেন না; কাঁচা রঙ" তেমনি গভর্ণমেণ্টের উচিত প্রতি বছর দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় বিজ্ঞাপন মেরে দেওয়া, 'ফরাসীরা সাবধান! বসন্ত এসেছে প্রেম নিয়ে।" কিন্তু সরকার যেহেতু তার কর্তব্য কচ্ছে না তাই আমিই আপনাকে বলছি, 'সাবধান। প্রেম।' রাশ্তায় যেমন ফ্রস্ট্-বাইট থেকে বিদেশীদের সাবধান করা হয় তেমনি আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রেম আপনার উপর ছোঁ মারল ব'লে।"

অবাক করলে ত লোকটা! বেশ গম্ভীর হয়ে বললুম,

"আমার মনে হয় আপনি অনধিকার-চর্চা কচ্ছেন।"

বিনীত আপত্তির ভঙ্গীতে সে উত্তর দিল,

"কি বলছেন আপনি! একটা মানুষ ডুবছে দেখে আমি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকব! আমার কথাটা শুনুন, তখন বুঝতে পারবেন কেন আমি এই অনধিকার চর্চা করছি। এই গত বছর, ঠিক এই সময়ে।

আমি প্রথমেই জানিয়ে রাখছি আপনাকে আমি নৌবিভাগে কেরাণীগিরি করি। সেখানে কমিশনাররা আর আমাদের ওপর-ওয়ালারা তাঁদের সোণার চেনের জোরে আমাদের সামান্য জাহাজের খালাসী মনে করেন। ওঃ, যদি তাঁরা একটু ভদ্র হতেন! যাক্ গে, বাজে কথায় চলে যাচ্ছি:

"অফিসের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল দীপ্ত নীল আকাশ, চাতক নেচে বেড়াচ্ছে।

কালো কালো অফিসের ফাইলগুলোর মধ্যেই ইচ্ছে হল নেচে উঠি। এত বেড়ে উঠল ছাড়া পাবার ইচ্ছা যে সাহসে বুক বেঁধে চলে গেলাম আমার ওপর-ওয়ালা দাস-চালকের কাছে। লোকটা খিটখিটে, থপ্পুরে, সব সময়েই চ'ড়ে আছে। বললাম শরীর খারাপ কচ্ছে। মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, "একটা কথাও আপনার আমি বিশ্বাস করি না। তবু যান আপনি। বলি, আপনার মত কেরাণী নিয়ে অফিস চলবে কি ক'রে?"

'বেরিয়ে চ'লে এলাম সীনের ধারে। ঠিক আজকের মতই ছিল সেদিনটা। ষ্টীমারে স্যাং ক্লোদের দিকে রওনা হলাম।'

'আহা মশায়, যদি আমার কর্ত্তা ছুটিটা না দিতেন! মনে হল আমার সমস্ত অন্তরটা যেন রোদ্দুরের তাতে ফুলে কেঁপে উঠছে। এই ষ্টীমার, নদী, গাছ-পালা, বাড়ী ঘর-দুয়োর, আশ-পাশের লোক—সবই ভালো লাগছে। যাহোক একটা কিছুকে আলিঙ্গন করতে পারলে যেন বেঁচে যাই। প্রেম তার ফাঁদ পাতছিল আমার জন্যে। ত্রোকাদেরোতে একটী মেয়ে একটা প্যাকেট হাতে আমার ঠিক সম্মুখেই এসে বসল। দেখতে সে ভালই ছিল কিন্তু প্রথম বসন্তের এই মনোরম পরিবেশে মেয়েরা যে আরও কত ভাল দেখায় তা কি বলব! একটা মাদক সুষমা

ঘিরে থাকে তাদের, একটা অদ্ভুত কিছু, যেটা মেয়েদের নিজস্ব : চিজ খাওয়ার পর মদের আস্বাদনের মত।

"যথারীতি আমি তাকালাম তার দিকে, সে তাকাল আমার দিকে, মাঝে মাঝে, যেমন আপনার দিকে এই মেয়েটি কচ্ছিল। যখন মনে হল এই দেখাদেখিতে অনেকখানি এগোনো গিয়েছে তখন কথা বললাম, সেও উত্তর দিল। সেই সুন্দর মুখের কথায় মাথা আমার ঘুরে গেল।

"সাঁ্যৎ ক্লোদে প্যাকেটটা দেবার জন্তে সে নামতেই তার পিছু নিলাম আমি। সেটা দিয়ে ফিরে এসে দেখল ষ্টীমার ছেড়ে দিয়েছে। তার পাশেই আমি। বাতাসের সৌরভে আর মিষ্টতায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছিল আমাদের।

' "বনের মধ্যে এখন ভারী সুন্দর," বললাম আমি।'

' "হাঁ, সত্যি," ' সে স্বীকার করল।

' "একটু চল না, যাওয়া যাক্," ' আমি সাহস ক'রে বললাম।

চোখের পাতার তলা দিয়ে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন সে আমাকে যাচাই ক'রে দেখল ; একটু দ্বিধা তার মনে।

"বনবীথি দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি আমরা। গাছের কচিপাতার স্বচ্ছ আশ্রয়ের তলায় সরল, মোটা, জ্বলজ্বলে সবুজ ঘাসের পাতাগুলো রোদ্দুরে স্নান কচ্ছে ; আর অসংখ্য পোকা-মাকড় সেই পাতার উপর আনন্দে প্রেম কচ্ছে। প্রতি ঝোপে পাখীর গান। মাটির সোঁদা গন্ধে আর খোলা হাওয়ায় খুসিতে ছোটাছুটি সুরু করে দিল আমার সঙ্গিনীটি। আমিও ছুটলাম তার পিছন, পিছন। এখন মনে হয় কি ছেলেমানুষের মত হাসিখুশি হয়ে উঠেছিলাম নেচে কুঁদে।

"কত যে গান সে গাইল আনন্দে, যাত্রা থিয়েটার থেকে, তার ইয়ত্তা নেই ; আর গাইল মাসেতের সেই গানটা। ওঃ মাসেতের সেই গানটা।

মনে হয়েছিল, ও রকম কবিতা আর হয় না! শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ঐ সব রাবিশ-গুলোই ত মাথা ঘুরিয়ে দেয় কি না। গান গাইতে পারে এমন মেয়েকে কখ্খনও বেড়াতে নিয়ে যাবেন না— বিশেষ ক'রে মাসেতের ঐ গানটা।

"ক্লান্ত হয়ে একটা সবুজ, তৃণভূমির উপর বসে পড়ল সে। তার পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিলাম নিজেকে, চেপে ধরলাম তার হাত দুটো— সূঁচের বিঁধেভরা ছোট ছোট দুটি হাত। সেই সূঁচের দাগগুলোয় বড় আঘাত লাগল মনে।

"এইগুলি," মনে মনে বললাম, "শ্রমের পবিত্র চিহ্ন"।

"কিন্তু মশায়, আপনি কি জানেন, ঐ পবিত্র চিহ্নগুলির মানেটা কি? ও গুলির মানে হচ্ছে কাজ-ঘরের যত খোস গল্প, যত ফিস্ ফাস্ নীচ কথা, অশ্লীল গল্পে ক্লিন্ন মন, যত নির্বোধ শকার বকার। যত কিছু নোংরা আচার ব্যবহার, ছোট লোকের মেয়েদের সবটুকু ক্লেদ আর নীচতা জমেছে ঐখানে। আর যাদের আঙুলের মাথায় দেখবেন ঐ রকম দাগ, তারা সব চেয়ে সরেশ।

"আমরা চেয়ে রইলাম বহুক্ষণ পরস্পরের চোখের দিকে।

"ওঃ, মেয়েমানুষের চোখ! কি ক্ষমতা ঐ চোখের—ভোলাবার, জয় করবার, মন কেড়ে নেবার! কি গভীর! এই জিনিষের নাম হচ্ছে

"হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব"। মশায়, যত সব বাজে বুকনি! যদি সত্যিই হৃদয় দেখা যেত ত মানুষ আরও বুঝে সুঝে চলত।

"এক কথায়, মশাই ঘটল এই: আমি পাগলামির বসে তাকে আলিঙ্গন করতে গেলাম।

"হাত সরাও", সে চেঁচিয়ে উঠল।

"দুঃখের ভারে আমি তার পায়ের উপর পড়ে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ

উজাড় ক'রে দিলাম। আমার এই পরিবর্তনে সে একটু বিস্মিত হয়ে চোখের কোণ থেকে দেখল আমাকে, যেন মনে মনে বলল, "ওঃ, তোমার দৌড় এই পর্য্যন্ত! বেশ বোক্-চন্দর, দেখা যাবে'।"

"প্রেমের ব্যাপারে আমরা পুরুষরা হচ্ছি সরল ক্রেতা আর মেয়েরা হচ্ছে সাবধানী দোকানী। তার সঙ্গে আমি যা খুসি কত্তে পাত্তাম তখন। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম আমার বোকামি। কিন্তু আমি কি চাইছিলাম জানেন: স্বপনের মত কিছু, কায়াহীন, অপার্থিব প্রেম। বস্তুটা যখন আমার হাতের কাছে তখন আমি খুঁজছিলাম ছায়া।

"আমার প্রেম প্রচার শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়ল সে। আমরা ফিরলাম স্যাংক্লোদে। পারী পৌঁছে তবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। তখন এত বিষণ্ণ দেখলাম তাকে যে না জিজ্ঞাসা ক'রে পারলাম না, কি কারণ।

"এই রকম দিন জীবনে কত কম।" সে উত্তর দিল।

"হৃদয় আমার বেদনায় টন্ টন্ করে উঠল।

"পরের রবিবারে দেখা হল, তারপর প্রত্যেক রবিবারে। তাকে নিয়ে বেড়ালাম বুগিভাল, সাঁং জার্মে, মাইসোঁ-লাফিৎ, পোয়াসি, সহরতলীর প্রেমিকদের সব পীঠস্থান।

"বাঁটকুল নায়িকাটি প্রেমের ভাণ করে এগিয়ে নিয়ে চলল আমাকে। মাথাটা আমার একেবারেই খেল সে। তিনমাস পরে বিয়ে হল আমাদের।

"আপনিই বলুন মশাই, আমার মত একজন নির্বান্ধব লোক, যাকে দুটো উপদেশ দেবার কেউ নেই, সেএছাড়া আর কি করবে। লোকে ভাবে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একা থাকতে পেলে কি সুখ! সেই আশায় বিয়ে করে লোকে। তারপর সুরু হয় বাক্যবাণ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেখা গেল প্রাণপ্রিয়াটি বোকা ত বটেই, মুখ্যুও বটে। মাসেতের সেই

গানটা, সেই অসহ্য গানটা নিয়ে সারাদিন গলা ফাটায়। কয়লাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে। দারোয়ানের বৌকে গিয়ে ঘরের খবর দিয়ে আসে। পাশের বাড়ীর চাকরটার সঙ্গে তার যত গোপন কথা। দোকানদারদের সঙ্গে বাধায় আমার বিপদ। আর তার মাথা ভর্ত্তি যত সব আজগুবি গল্প, অসহ্য কুসংস্কার, হাস্যকর সব ধারণা। এক এক সময় দুঃখে, ক্ষোভে কান্না পায় আমার।"

এত উত্তেজিত হয়েছিল ভদ্রলোক যে দম নেবার জন্যে সে থেমে গেল। এই সরল, হতভাগ্যটির উপর করুণা হল আমার। তার কথার উত্তর দিতে যাব, ষ্টীমার পৌঁছে গেল সাঁৎক্রোদ। আমার সেই মেয়েটি নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে, একটু চেয়ে আমাকে ঘেঁষেই চলে গেল সে প্রলুব্ধ ক'রে; গিয়ে দাঁড়াল নৌকোর উপর।

তাকে অনুসরণ করবার জন্যে আমি লাফিয়ে উঠতেই ভদ্রলোক আমার জামার আস্তিন ধরল চেপে। এক ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিতেই সে আমার কোটের পিছন চেপে ধরে পেছন দিকে টানতে টানতে চীৎকার ক'রে উঠল, "যাওয়া হবে না, হ'বে না।" ষ্টীমারের সব যাত্রী ফিরে তাকাল। চারিদিকে উঠল হাসির হুল্লোর আর আমি স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম জ্বলতে জ্বলতে। কিন্তু সাহস হল না এই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ উপেক্ষা করবার।

'ষ্টীমার ছেড়ে দিল।

'মেয়েটি নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে দেখল আমার চলে যাওয়া। আর আমার শাস্তিদাতা হাত কচলাতে কচলাতে কানে কানে বলল, 'যাক্ বাঁচিয়ে দিলাম আপনাকে'।
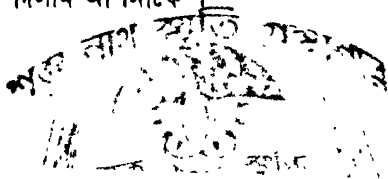
বেচারা মেয়েটা

না, সেই সন্ধ্যার কথা মন থেকে কিছুতেই মুছবে না। আধ ঘণ্টা ধরে কেবলই মনে হতে লাগল এর হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাব না—একটা বিশ্রী অশুভ অনুভূতি। মনে হল যেন গভীর একটা খনিতে নামছি বেগে: অঙ্গে অঙ্গে ভয়ার্ত্ত শিহরণ। ভাবছি, এর চেয়ে বেশী দুঃখ কি জীবনে পাওয়া সম্ভব? আর ভালো করে বুঝছি যে সাধু হওয়া সব সময় সম্ভব নয় জীবনে।

ঘড়িতে সবে বারটা বেজেছে। রাস্তায় ভীড়—সকলের মাথায় ছাতা। তারই পেছনে আমি বদ্‌ভিল্ থেকে ক্রও ষ্ট্রীটে যাচ্ছি। বৃষ্টি পড়ছে বললে ভুল হবে, প্লাবিত করছে, ঢেকে গিয়েছে গ্যাসের আলো—পথের আকৃতি বিষণ্ণ। কাদায় আঠালো ফুটপাথ চকচকে। কোনোদিকে না তাকিয়ে জনতা চলেছে ঠেলাঠেলি ক'রে।

স্কার্ট তুলে ধ'রে ছায়াচ্ছন্ন দরজার ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েরা—তাদের গুল্‌ফ উন্মুক্ত, শাদা মোজা দেখা যাচ্ছে রাত্রির আবছা আলোয়। তারা কেউ ডাকছে, কোন সাহসিকা আবার রাস্তার লোকেদের ধাক্কা দিয়ে তাদের কানে কানে বলছে দুটি ভোঁতা, অশ্লীল কথা। কোনো একজনের পেছু পেছু কয়েক পা গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে তার মুখে উদ্গার ক'রে দিচ্ছে মলিন নিশ্বাস। তারপর ছলাকলায় কাজ হ'ল না দেখে হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ গতিতে মাজা দুলিয়ে আবার সুরু করছে চলতে।

আমাকেও ডাকছে, জামার আস্তিন ধ'রে টানছে, তেত-বিরক্ত ক'রে দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি কি, ওদেরই জন তিনেক পরস্পরকে

তাড়াতাড়ি কি বলতে বলতে যেন ভীত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। অন্যেরাও ছুটল তার পর, আরম্ভ করল পালাতে; স্ুট্ ক'রে পালাতে পারবে ব'লে গাউন তুলে ধরেছে ওরা দুই হাতে। সেদিন বেশ্যাবৃত্তির মৌচাকে ঢিল পড়েছিল।

চকিতে আমার বাহুর তলে গলে গেল একখানি বাহু, ত্রস্ত কণ্ঠস্বর ফিস্‌ফিসিয়ে কানে এল, 'বাঁচান, আমাকে বাঁচান! এমনি ক'রে ফেলে যাবেন না আমাকে!'

তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটার পানে; বয়স এখনও কুড়িও হয়নি, এর মধ্যেই ক্ষইতে স্ুরু করেছে। আমি বললাম, 'এস আমার সঙ্গে।' সে বলল মৃদুস্বরে, 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

পুলিশের লাইনে পৌঁছে সে আমার হাত ছেড়ে দিল, আমি পার হয়ে গেলাম। আবার তার সঙ্গে দেখা ক্রও ষ্ট্রীটে।

সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমার বাড়ীতে আসবেন না একবার?'

'না।'

'কেন? আপনার আজকের এই উপকার আমি কোনোদিন ভুলব ভেবেছেন?'

সে যাতে অপ্রস্তুত না হয় এমনি ভাবে বললাম, 'আমি বিবাহিত কি না।'

'তাতে কি হয়েছে!'

'সেইটাই ত যথেষ্ট কারণ, বাছা। তোমার বিপদ কাটিয়ে দিয়েছি; এখন যাও, আমাকে আর বিরক্ত ক'র না।'

জনহীন, অন্ধকার পথ; সত্যিই অস্বস্তিকর। তার উপর এই নারীর বাহুবন্ধন। যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম সেটা যেন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। মেয়েটা আমাকে আলিঙ্গন করতে এল; আমি শঙ্কায় পেছিয়ে

এলাম। কঠিন স্বরে সে বললে, 'একবার করলে কি ক্ষতি হবে আপনার ?'

তারপর ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী ক'রেই, কোথাও কিছু নেই, ফুপিয়ে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ; শেষে বললাম,

'কি হয়েছে তোমার বলত ?'

চোখের জলের মধ্য দিয়ে মিন্ মিন্ ক'রে বলল সে, 'আপনি ত জানেন না কি কষ্ট এতে।'

'কিসে কষ্ট ?'

'এই আমাদের জীবনে।'

'তাহলে এতে এলে কেন ?'

'আমি ত ইচ্ছে ক'রে আসি নি।'

'কে নিয়ে এল তোমাকে ?'

'জানি আমি, জানি, কে নিয়ে এসেছিল আমাকে।'

এই সমাজ-পরিত্যক্তাটির সম্বন্ধে কৌতূহল পেয়ে বসল আমাকে ; বললাম,

'বল তোমার জীবনের কথা ; আমি শুনব।'

সে বলে গেল আমাকে :

'আমার তখন ষোল বছর বয়েস ; ইভেতোর এক ধান-চালের কারবারী মঁসিয়ে লেরেবল্-এর বাড়ী কাজ করি। আমার বাপ মা ছিল না, কেউ-ই ছিল না কোথাও। মনিব অদ্ভুত চোখে তাকাত আমার দিকে, গালও টিপে দিত। সে সবের যে কি অর্থ তা বুঝতে বিশেষ দেরী লাগল না। তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে ছেলে-মেয়ে একটু শীগ্গিরই পাকে ; আমি তাই বুঝতাম সবই। তবুও মঁসিয়ে লেরেবল্ বৃদ্ধ, প্রতি রবিবার

গির্জায় যায়, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি আছে। আমার কেমন যেন মনে হত যে ঐ বৃদ্ধ ও রকম হতে পারে না! তবু একদিন রান্নাঘরে সে এসে উপস্থিত আমার কাছে। বাধা দিলাম, কিন্তু বৃথা।

'আমাদের বাড়ীর বিপরীত দিকেই মঁসিয়ে দানৃস্তানের মুদিখানার দোকান। দোকানের কর্মচারী ছেলেটা বেশ। এমন ভালো লেগেছিল তাকে যে তার কথায় আমি বিশ্বাস ক'রে ফেললাম। এ রকম ত সকলেই করে, করে না? সন্ধ্যাবেলায় তার আসার জন্যে আমি দরজা খুলে রেখে দিতাম।

'কিন্তু একদিন রাতে লেরেব্ল্ কি একটা শব্দ শুনে আমার ঘরে উঠে এসে আঁতয়েন্‌কে দেখে খুন করতে গেল তাকে। চেয়ার, কুঁজো, টেবিল ছুঁড়ে সে কি মারামারি! সেই ফাঁকে সাহস ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সেই আমার চলা সুরু।

'ভয় করতে লাগল বেরিয়ে এসে—অপরিচিত পৃথিবী। একটা দরজার নীচে দাঁড়িয়ে পোষাক প'রে নিয়ে আমি সোজা হেঁটে চললাম। ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম যে ওদের মধ্যে একজনা খুন হয়েছেই আর পুলিশ ধাওয়া করেছে আমার পেছনে। রোয়াঁর পথে এসে পড়লাম; ভাবলাম রোয়াঁয় আত্মগোপন করার সুবিধা পাওয়া যাবে।

'রাস্তা বড় অন্ধকার, পাশের খানা দেখা যায় না। এখানে ওখানে গোলাবাড়ী থেকে কুকুর ডাকছে। রাতে কত রকম সব অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, জানেন? পাখী ডাকে যেন খুন্-হওয়া মানুষ কাতরাচ্ছে। কোনো জানোয়ার ভেক্ ভেক্ ক'রে ডাকে আবার কোনো জানোয়ার যেন শিস্ দেয়; আরও কত রকম শব্দ, আমি বুঝতেই পারি না সব। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। প্রতিবার পা ফেলি আর দুর্গানাম জপ করি। ওতে যে কত বল পাওয়া যায় তা কল্পনাই করতে পারবেন না।

দিনে আবার পুলিশের ভয় পেয়ে বসে; আর আমি প্রাণ বের ক'রে ছুটি। শেষে চেষ্টা করলাম শান্ত হবার।

ভয় লাগলে কি হবে, ক্ষিদে তেমনিই পায়। কি খাব? হাতে এক পয়সা নেই। আসবার সময় ভুলে ফেলে এসেছি সব; সেই সবই বা আর কত—টাকা দশেক। খালি পেটেই পথ পার হয়ে চলেছি।

গরম লাগছে; সূর্য পুড়ছে আকাশে। দুপুর পেরিয়ে গেল, তবু চলেছি। পেছনে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ। ফিরে তাকিয়ে দেখি ঘোড়ায়-চড়া পুলিশ। রক্ত লাফিয়ে উঠল বুকে; মনে হল পড়ে যাব; তবু চললা'ম। ওরা ধরবে আমাকে; তাকাচ্ছে আমার দিকে। দুজনের মধ্যে বয়েস-বেশী পুলিশটা বললে,

"নমস্কার, মাদ্‌মোয়াজেল্"

"নমস্কার", আমি বললাম

"কোথায় যাচ্ছ" ?

"একটা কাজ পেয়েছি রোয়াঁয়, তাই যাচ্ছি।"

"এইভাবে হেঁটে?"

"হ্যাঁ, হেঁটে" ?

'এমন বুক দুরদুর্ করতে লাগল যে আর কথা কইতে পারলাম না; ভাবতে লাগলাম; "এইবার ত ওরা আমাকে ধরবে"। পালাবার জন্যে পা দুটো যেন নাচতে লাগল। কিন্তু ধ'রে ত তারা আমাকে ফেলবেই।

বুড়ো পুলিশটা বললে, "বারাঁতি পর্য্যন্ত এই রাস্তা দিয়েই আমরা যাব। এস এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।"

"বেশ ত", বললাম আমি।

'একটু-একটু গল্প হল। বুঝতেই পাচ্ছেন, যথাসম্ভব তাদের খুশী

করবার চেষ্টা করলাম। তারা ভুলে গেল ; সত্যি বলে ধ'রে নিল আমার খুসী। একটা বনে ঢুকতেই সে বললে, 'এস না, এইখানে ব'সে একটু বিশ্রাম ক'রে নি।"

'আমি না ভেবে চিন্তেই বললাম, "এস।"

'সে তখন নেমে ঘোড়াটাকে সঙ্গীর হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে বনের ভেতরে ঢুকতে লাগল। বলবার কিছু নেই। আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন? নিজে সে যেমন-খুসী উপভোগের পর আমাকে বললে, "সঙ্গীর কথা ভুললে ত চলবে না"।

'সে ফিরে গেলে তার সঙ্গী এল আমার কাছে। লজ্জায় কাঁদতে ইচ্ছা করছিল আমার। তবু, বুঝতেই ত পারেন, বাধা দিতে পারলাম না। তারপর আবার পথে। মনে এত দুঃখু যে কথা আর মুখে জোগায় না। তারপর ক্ষিদেয় আর চলতে পারি না। গ্রামে পৌঁছে ওরা আমাকে এক গেলাস মদ দিল ; খেয়ে যেন নতুন বল পেলাম কিছুক্ষণ। দেখলাম ওরা জোরে চালিয়ে দিলে ঘোড়া—বারঁাতি পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে চায় না, এই আর কি। একটা খানার ধারে বসে চোখের জল নিঃশেষ ক'রে কাঁদলাম।

'আরও ঘণ্টা তিনেক হেঁটে সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছালাম রোয়াঁ। আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। কিন্তু কোথায় ব'সে একটু বিশ্রাম করি? পথে আসতে খানা ডোবার ধারে ঘাসের উপর বসেছি, শুয়েছি। সহরে যে সে সব কিছুই নেই।

'দেহ আর বইছে না ; এখনি ভেঙে পড়বে বোধ হচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হল, পাতলা, হালকা বৃষ্টি এই এখন যেমন হচ্ছে। বুঝতে না পারলেও গা ভিজে ওঠে। বৃষ্টি হলেই দেখি আমার কপালে দুঃখু আছে। পথে চলতে চলতে সব বাড়ীগুলোর দিকে তাকাই আর মনে মনে বলি,

"ওখানে খাবার আছে, বিছানা আছে; আমার ভাগ্যে এক টুকরো রুটি কি একটা খড়ের বিছানাও জোটে না।"

'কতকগুলি রাস্তায় দেখলাম মেয়েছেলেরা পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমাকেও ত বাঁচতে হবে। তাদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলাম। কেউ উত্তর দেয় না ডাকে। ভাবলাম, মরণ হয় না কেন আমার। তখন মাঝরাতের কাছাকাছি হবে; কি যে ক'রে চলেছি কিছুই তখন আর বুঝতে পাচ্ছি না। শেষে আমার ডাক শুনে একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় থাক?" মিথ্যে কথা না বললে নয়; বললাম, "আমি মায়ের সঙ্গে থাকি যে। সেখানে ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। অন্য কোনো বাড়ীতে কি যাওয়া যায় না?"

'সে উত্তর দিল, "পয়সা খরচ ক'রে ঘর আমি বড় ভাড়া নিই না।" তারপরে বললে, "আচ্ছা, এস। একটা নিরিবিলি জায়গা আছে—সেখানে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।"

'একটা পুল পার হয়ে আমাকে নিয়ে লোকটা সহরের প্রান্তে নদীর ধারে এক মাঠে এসে উপস্থিত হল। তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। এক জায়গায় আমাকে বসিয়ে বলল, কেন আমরা সেখানে এসেছি।

'যেন শেষই হতে চায় না লোকটার। ক্লান্তিতে আমি ঘুমিয়ে পড়তে লোকটা আমায় কিছু না দিয়েই চ'লে গেল। এক পা চলবার মত চোখের জোরও আর আমার নেই। সেই যে ঠাণ্ডায় সারা রাত্রি শুয়ে রইলাম, সেই থেকে কি যে রোগে ধরল কিছুতেই আর সারাতে পাচ্ছি না।

' দু জন পুলিসের লোক আমায় জাগিয়ে প্রথমে থানায় তারপরে

গারদে নিয়ে গেল। সেখানে রইলাম আটদিন। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, এইসব নানারকম প্রশ্ন চলল কয়দিন ধরে। ভয়ে আমি কিছু না বলতে পারলেও তারা সবই জেনে ফেলে মকদ্দমায় নিরপরাধ প্রমাণ হওয়ায় ছেড়ে দিলে আমাকে।

'এইবারে অন্নচিন্তা। দাগী বলে কাজ কোথাও জুটল না। তারপরে মনে হল, যে বিচারক আমার বিচার করেছে তার চোখেও ত সেই পুরোনো মনিব লেরেব্লের মত দৃষ্টি দেখেছি; তাকে খুঁজে বের ক'রে দেখলাম আমি ভুল বুঝি নি। যখন চ'লে আসি তখন সে আমায় তিনটে টাকা দিয়ে বললে, "যখনই আসবে এত ক'রেই পাবে; তবে বেশী এস না—এই সপ্তাহে দু বারের বেশী নয়।" বুঝে গেলাম আমি। ভদ্র লোকের বয়েস হয়েছে ত। তবু ভাবলাম মনে মনে, "কম বয়েসের লোকেরা যে আমোদ করে তারা ত এমন মোটা নয়। বুড়োদের এ কী রকম।" তারপর থেকেই আমি বুড়োদের দেখলেই বুঝতে পারি—চোখ-ব'সে-যাওয়া বুড়ো বাঁদরগুলো, ভূতের মত মাথাটা।

'জানেন, আমি কি করলাম তারপর? আমি যেন গেঁয়ো মেয়ে, সহরে বাজার করতে এসেছি—এইভাবে সেজে ঘুরতাম রাস্তায় রাস্তায় জীবিকার অন্বেষণে। দেখলেই বুঝতে পারি কে শিকার হবে। মনে মনে বলি, 'এই যে, এ টোপ গিল্‌বে।' সে এগিয়ে আসে, বলে,

"নমস্কার মাদ্‌মোয়াজেল"

"নমস্কার"

"এইভাবে যাচ্ছ কোথায়?"

"বাবুদের বাড়ী"

"তোমার বাবুরা দূরে থাকে না কি?"

"হাঁ, একটু দূর বটে; তবে বেশী নয়।"

'তারপরে সে কি বলবে ভেবে পায় না। আমি গতি শ্লথ ক'রে তাকে কথা বলবার অবকাশ দিই। মৃদু গলায় স্তুতিবাদ ক'রে সে অনুরোধ করে তার বাড়ী যেতে। বুঝতেই পারেন, প্রথমে না বলে তারপরে হাঁ বলি। এ রকম দু তিনটে আসেই রোজ সকালে; সন্ধ্যাটা খালি থাকি। এই সময়টা আমার বেশ সুখে কেটেছে। আর সুখ ত আমি চাই।

'কিন্তু বেশী দিন কারও ভালো যায় না। কপাল ভাঙল এক বড় লোক, পঁচাত্তর বছরের বুড়ো, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরিচয় হয়ে; ঘড়েল লোক। একদিন পাড়ার এক রেস্তোরাঁয় আমায় নিয়ে খেতে এসে, বলব কি আপনাকে, আর কিছু বাকী রাখলে না!' খাওয়া আর তাকে শেষ করতে হল না—সেইখানেই হয়ে গেল তার।

'পুলিশের খাতায় নাম লেখানো নেই বলে তিন মাস জেল খাটতে হল। তারপর এলাম পারী। এখানে কি মানুষ বাঁচতে পারে, বলুন আপনি! কি কষ্ট এখানে বাঁচা! এত লোক এখানে যে, সকলের দু বেলা খাওয়াই জোটে না। লোক যত, কষ্টও তেমনি; আর প্রত্যেকে নিজেরটি নিয়েই ব্যস্ত।'

চুপ করল মেয়েটা। আর্দ্র হৃদয়ে তার পাশে পাশে চলেছি আমি; হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিতের মত বলে উঠল.

'তাহলে তুমি যাবে না আমার বাড়ী, যাবে না ত?'

'না; আমি ত তোমাকে আগেই ব'লে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, তাহলে নমস্কার। মনে কিছু কর না, ধন্যবাদ। কিন্তু এ কথাও তোমাকে বলে যাচ্ছি যে তুমি ভুল বুঝেছ।'

চ'লে গেল সে, সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের মত বৃষ্টির তলা দিয়ে, ঐ গ্যাসের আলোর নীচে দিয়ে; তারপরে ছায়ায় মিলিয়ে গেল। বেচারা মেয়েটা!

কুচ্ছিত্

এই যুগটার কথাই বলি : সবাই এখন মধ্যবিত্ততার চাপে সমান, সবাই ঠিক ঠাক চলে ঘৃণ্য নিয়মানুবর্তিতায়। সকলে হতে চায় সকলের মত, ফলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বেয়ারার তফাৎ বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে; এই সব হল ভবিষ্যতের সেই স্বর্ণযুগের পূর্বাভাস যখন সব কিছুই হয়ে যাবে বোদা, নীরঙা, নির্বিশেষ, সকল বৈচিত্র্যহীন। তা এই যে আমাদের সব সমান ক'রে দেওয়া যুগ, এই যুগে কেউ যদি কুচ্ছিত্ হয় ত কি বলবার আছে? বরং কুচ্ছিত্ হবার তার অধিকার আছে, কুচ্ছিত হওয়া তার কর্ত্তব্য।

লেবো অবশ্য অতি নির্ম্মম উৎসাহে এই অধিকার খাটাচ্ছিল, হিংস্র বীর্যে পালন করছিল এই কর্তব্য। তার ওপর ভাগ্যের গভীর পরিহাসে তার জন্ম হল লেবো নাম নিয়ে আর এক চতুর ধর্মপিতা, ভাগ্যের লীলায় অজ্ঞাত সহচরের মতই তার খ্রীষ্টান্ নাম রেখেছিল আঁতিনু [অসাধারণ সুন্দর একটী ছেলে, সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের (১১৭-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) পরিচারক এবং তার অমিত স্নেহের পাত্র। নাইলের জলে ডুবে সে মারা যায়—কেউ বলে দুর্ঘটনায় কেউ বলে সম্রাটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে।]

আমাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যৎ সার্বজনীন বিদঘুটেমির সোজা সড়ক দিয়ে চলেছে তাদের মধ্যেও আঁতিনু কুচ্ছিত্ বলে বিখ্যাত; মনে হয় সে যেন উৎসাহ, অত্যন্ত উৎসাহ পেত এই ব্যাপারে। অবশ্য মিরাবোর মত হত-কুচ্ছিত্ লেবো নয়। মিরাবোকে দেখলেই লোকে বলত, 'ঐ যে, রূপ চলেছেন; রাক্ষুসে রূপ বাবা!

হায়, তাও না। মিরাবোর কুশ্রীতায় কোন সৌন্দর্যই ছিল না।

সে কদাকার, ব্যস্, আর কিছু নয়। এক কথায় সে কদর্য-রকম কদাকার। তার পিঠে না আছে কুঁজ, না আছে তার বাঁকা পা, না আছে ভুঁড়ি। চিমটের সঙ্গে তার পায়ের কোনই সাদৃশ্য নেই। হাতদুটো খুব লম্বাও নয়, খুব ছোটও নয়। তার দেহে বিন্দুমাত্র কদর্যতার সামঞ্জস্য চিত্রকরদের চোখে ত পড়েই না, এমন কি রাস্তার লোক তাকে দেখলেই আর ফিরে না তাকিয়ে ভাবত, 'বাব্বাঃ, এ কি রে!'

চুলের তার কোনো রঙ নেই— হালকা চেস্‌নাট আর হলদের মেশা। চুলও বেশী নেই তবে ঠিক টাকও বলা চলে না; যে কটি আছে তাতে তার মাখন রঙের মাথাটা ফুটে উঠার পক্ষে যথেষ্ট। মাখন রঙ? তাও বলা যায় না। মার্গারিন্— কৃত্রিম মাখন রঙ বললে ভালো হয়, একেবারে হালকা মার্গারিন্।

মুখের রঙ-ও ঐ রকম তবে সেটা নিশ্চয়ই মিশেল মার্গারিন, খাঁটি নয়। মুখের তুলনায় খুতির রঙটাকে খাঁটি মার্গারিন, প্রায় মাখন বলা যেতে পারে।

তার মুখ সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলবার নেই বললেও যেন বেশী বলা হয়। সবশুদ্ধ মিলিয়ে মুখটা 'কিছুই নয়; শুধু রাক্ষুসে।'

ধরে নেন আমি তার সম্বন্ধে কিছুই বলি নি; বর্ণনার এ ব্যর্থ প্রচেষ্টার স্থানে আমরা এই কাযকরী সূত্রটা বসিয়ে দিতে পারি, 'বর্ণনা অসম্ভব।' কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে আঁতিন্ন লেবো-ও কুচ্ছিত্; লোকে তাকে দেখলেই সেটা বুঝতে পারত; ভাবত, এর চেয়ে কুচ্ছিৎ লোক জীবনে দেখি নি। আর এমনিই দুর্ভাগ্য যে লেবোও তাই মনে করত।

তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে লেবো হাঁদাও নয়, বদ্-মেজাজীও নয়; তবে মনে তার সুখ নেই। অসুখী লোক কেবল তার দুর্দশার কথাই ভাবে; তার মাথার টুপীকে লোকে ভাবে গাধার টুপী। লোকের

দোষই হল হাসি-খুশী না হলে ভালো লোককেও লোকে ভালো বলে না। ফলে আঁতিনু লেবোকে লোকে বদমেজাজী গবেট বলেই জানত। কুচ্ছিৎ বলে একটু দয়াও কেউ তাকে করত না।

লেবোর জীবনে একটী মাত্র আনন্দ ছিল অন্ধকার রাতে এঁদো রাস্তা দিয়ে ঘোরা। পথচারিকারা ডেকে বলত,

'ও ভূত-দা, আমাদের বাড়ী এস না। তুমি ভারী সুন্দর!'

লেবো বুঝত ওদের কথা সত্যি নয়; তাই সে চুরি ক'রে পেত এই আনন্দটুকু। কেন না, মাঝে মাঝে, কোনো বৃদ্ধা কি মাতাল্নীর আমন্ত্রণে ঘরে গিয়ে যেই সে দাঁড়াত আলোর সামনে অমনি তারা আর 'ও সুন্দর ভূতো' ব'লে তাকে ভুল করত না। বৃদ্ধা তার সামনে আরও বুড়ো হয়ে যেত আর মাতাল্নীর নেশা যেত ছুটে। এই সব মেয়েদের রুচির বালাই ত নেই; তবু দরাজ পাওনার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তারা একাধিকবার লেবোকে বলেছে,

'ওহে ভাই বাঁটুল, তুমি সত্যিই যাচ্ছেতাই দেখতে।'

একদিন একটা মেয়েমানুষ তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চরম কথা ব'লে দিলে তাকে, 'আমার দেখছি বেধড়ক ক্ষিদে পেয়েছিল।' সেই দিন থেকে এই দুঃখের আনন্দটুকু পাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে লেবো।

ক্ষুধার্ত্ত ত সেই—চিরদিন সুখ থেকে বঞ্চিত। একটুখানি ভালো-বাসার মত কিছুর জন্যে সে ক্ষুধার্ত। একটা পথের কুকুরের মত সকলের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে, নিজের কুশ্রীতায় বাজেয়াপ্ত হয়ে আর সে থাকতে পাচ্ছে না! কুরূপ-তম, ঘৃণ্যতম স্ত্রীলোকও তার চোখে সুন্দর হয়ে উঠতে পারত যদি সেই নারী একবার বলত 'না, তুমি কুচ্ছিৎ নও' অথবা ভাবেও সেই রকম অন্তত দেখাত। সে কাছে এলে ভয়ে ঘৃণায় পেছিয়ে যাবে না এমন কি কেউ নেই?

শেষে ঘটল এই : একদিন রাস্তায় এক দীন দুঃখী মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা ; তার চোখ দুটো বেশ স্বচ্ছ, সারা মুখে ঘায়ের দাগ, অত্যন্ত মদ খাওয়ার লক্ষণ দেহে সুস্পষ্ট ; মুখ দিয়ে লাল পড়ছে ; নোংরা, ছেঁড়া সায়া পরনে। লেবো তাকে মুক্তহস্তে ভিক্ষে দিলে মেয়েমানুষটা চুমু খেল তার হাতে। তাকে লেবো বাড়ী নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পুঁছে, শুশ্রূষা ক'রে প্রথমে পরিচারিকা, তার পরে ঘরকন্নার কর্ত্রী তারপর প্রিয়া, তারপর স্ত্রী-র পদে উন্নীত করলে।

স্ত্রীলোকটা প্রায় লেবোর মতই কুচ্ছিৎ—প্রায় কিন্তু একেবারে নয় ; কেন না সে, যাকে বলে, ভয়াবহ ; ভয়াবহতার একটা মোহ অবশ্যই আছে—সেই মোহ, যা দিয়ে পুরুষ মানুষকে ভোলানো যায়। মোহ যে তার আছে তা স্ত্রীলোকটা প্রমাণ ক'রে দিল প্রথমে লেবোকে ঠকিয়ে, তারপরে সোজাসুজি আর একটা লোককে ফাঁদে ফেলে।

সে লোকটা আবার সত্যিই লেবোর চেয়েও কুচ্ছিৎ।

যত রকমের দৈহিক ও নৈতিক কদর্যতা থাকতে পারে তা এ লোকটার আছে—মেয়েমানুষটার আগের ভবঘুরে, ভিখিরী সঙ্গীদের একজনা। জেলের কয়েদী লোকটা, ছোট ছোট মেয়ের কারবার করে ; নোংরায় ভর্তি একটা বাউণ্ডুলে, পা দুটো কট্‌কটে বেঙের মতন, বান্ মাছের মত মুখ, আর মাথা ত নয় যেন মড়ার খুলি, তাতে নাকের বদলে শুধু দুটো ফুটো, বাকীটা খ'সে গিয়েছে।

'আমার বাড়ীতে ব'সেই তুই কি না এই কাণ্ড করলি!' পত্নী-হারা লেবো বললে পত্নীকে 'আর এমন ক'রেই করলি যে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে গেলি! কেন, কেন, হতভাগি? চোখে কি তোর ঢেলা বেরিয়েছিল? দেখতে পেলি না যে ও আমার চেয়েও কুচ্ছিৎ।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েমানুষটা, 'যা ইচ্ছে ব'লে যা না। বল্ যে আমি

বেবুশ্যে, আমি ছেনাল। কিন্তু তোর চেয়ে ও কুচ্ছিৎ, এ কথা বলিস্ নে।'

হতভাগ্য লেবো এই শেষ কথাটায় একেবারে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। মেয়েমানুষটা ভাবেও নি এই কথা ক'টা কী গভীর ভাবে বাজবে ওর বুকে—কত অসহ্য লেবোর কাছে ঐ কথা ক'টা। সে তখনও বলে চলেছে।

'দেখছিস্ না, ও কুচ্ছিৎ হলেও ওর একটা ইয়ে আছে; কিন্তু তুই যে একেবারে যার তার মত কুচ্ছিৎ।'

যমদূত

ডাক্তার আর কেষাণ কথা বলছে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে; কেষাণের মুমূর্ষু মা বিছানায় শুয়ে দেখছে ওদের টুক্ টুক্ ক'রে আর শুনছে ওদের কথা। নিজের অবস্থা তার কাছে অগোচর নেই। সে জানে সে মরতে বসেছে। কোনও অভিযোগও নেই মনে; সব মেনে নিয়েছে কেষাণের মা। বয়েস তার বিরেনব্বুই—আর কতদিন বাঁচতে পারে মানুষ? সময় হয়ে গিয়েছে যে।

খোলা জানলা দরজা দিয়ে গ্রীষ্মের রোদ্দুর আসছে ঘরে—যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে বাদামী রঙের মাটির অসমান মেঝে—চার পুরুষের পায়ের চিহ্ন-ভরা মেঝে। সেই রোদে তপ্ত শস্য-শষ্পের গন্ধ বাতাসে বয়ে আনছে ঝলকে ঝলকে। ডেকে ডেকে ফড়িঙের গলা ভেঙেছে—সারা দিগরটা ভরে গিয়েছে ওদের ঐকাতানে। মনে হচ্ছে মেলায় কাঠের তৈরী অসংখ্য কট্‌কটী এক সঙ্গে বেজে চলেছে।

ডাক্তারের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল,

'এই অবস্থায় মাকে একা ফেলে তোমার যাওয়া হতে পারে না, ওনোরে। যে কোন মুহূর্তে ওর হয়ে যেতে পারে।'

ওনোরে, অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে উত্তর দিল,

'যাই হোক্ না কেন, গমটা ত আমায় ঘরে তুলতেই হবে। বহুদিন মাঠে ফেলে রেখেছি। এই সময়টায় না হলে আর হবে না। তুমি কি বল, মা?'

মরতে বসেছে বুড়ী; তবু রক্তে এখনও নর্ম্যানের লোভ। সে ঘাড়

নেড়ে মত দিলে। ছেলে মাঠে গিয়ে গম এনে ঘরে তুলুক; সে একা একাই মরবে।

বিরক্তিতে মাটিতে পা ঠুকে ডাক্তার বললে,

তুই একটা জানোয়ার, বুঝলি, একটা জানোয়ার। সোজা ব'লে দিচ্ছি, এখন ও সব গম টম তুলতে তোকে আমি দেব না। যদি যেতেই হয় ত রাপে ধাইকে এনে মায়ের কাছে রেখে তবে যা। এ তোকে করতেই হবে। যদি না করিস্ তবে নিজে যখন অসুখে পড়বি এক দাগ ওষুধ দেব না। কুকুরের মত মরবি তখন—সে কথা যেন মনে থাকে।'

ঢ্যাঙা রোগা ওনোরে; নড়তে দেরী লাগে তার। কি করবে ঠিক করতে না পেরে বড়ই অস্বস্তিতে পড়েছে। সে ডাক্তারকে ভয় করে, এদিকে টাকার লোভও ভয়ানক। দ্বিধায় প'ড়ে হিসেব করতে লাগল ওনোরে; শেষে গড়িমিসি করে জিজ্ঞাসা করলে 'রাপের মাসী রোগীর সেবা করতে কত করে নেয়?'

'তা আমি কি ক'রে বলব', ডাক্তার জবাব দিলে 'যতক্ষণ থাকতে হবে সেই হিসেবে নেবে। দোহাই তোর, একটা রফা ক'রে তাকে নিয়ে আয়। এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে না আনতে পারলে দেখবি মজা।'

মন ঠিক করে শেষে ওনোরে বলল, 'আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, যাচ্ছি। আপনি আর চটাচটি করবেন না।'

ডাক্তার একটু বিদায়-ভর্ৎসনা দিয়ে দিলে,

'সাবধান কিন্তু বলে দিচ্ছি; আমাকে চটাস্ নে।'

একা পেয়ে তখন মা-কে বললে ওনোরে, আত্মসমর্পণের সুরে, 'ডাক্তার যখন বলছে তখন রাপেকে আনতেই হবে। আমি যাচ্ছি। না আসা পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে থাক।'

তারপরে ডাক্তারের পেছন পেছন সেও বেরিয়ে গেল।

ধাত্রী রাপে বুড়ী, জামা কাপড় ইস্ত্রী করে। গ্রামে বা আশেপাশে যারা মরতে বসেছে তাদের শুশ্রূষা করে এবং মরণের পরে শব আগলে ব'সে থাকে। আর যে মুহূর্ত্তে তার মরা খদ্দেরদের ঢাকবার খোল সেলাই হয়ে যায় সেই মুহূর্ত্তেই আবার সে জ্যান্ত খদ্দেরদের জামা কাপড় ইস্ত্রী সুরু করে। মড়া খদ্দের-রা অবশ্য সে খোল আর ইস্ত্রী করবার জন্তে খোলে না কখনও। গত বছরের শুকনো আপেলের মত তার মুখের চামড়া কোঁচকানো। রাপে রাগী, হিংসুক, আর তার লোভ দেখলে মনে হবে না যে সে মানুষ। ওপর দিকে আর নীচের দিকে সমানতালে ইস্ত্রী চালিয়ে চালিয়ে তার পিঠ যেন ভেঙ্গে একেবারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। আর মুমূর্ষুদের প্রতি তার অস্বাভাবিক আকর্ষণ দেখলে ভয় লাগে; মরছে যারা তাদের কাছে তাকে যেতেই হ'বে। যাঁদের সে মরতে দেখেছে কেবল তাদেরই গল্প তার মুখে। শিকারী যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তার প্রত্যেকটি শিকারের তেমনি ক'রে প্রত্যেকটি মরণের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত সে গল্প ক'রে যেত, কখনও একটা কথা এদিক ওদিক হতে দেখা যায় নি।

ওনোরে বোঁতাঁ তার বাড়ী ঢুকে দেখল গ্রামের মেয়েদের লেসের কলার কাচবার জন্তে বুড়ী রাপে জলে নীল গুলছে। ওনোরে বললে, 'কেমন আছ মাসী? সব ঠিক চলছে ত?'

তার দিকে ফিরে বুড়ী উত্তর দিলে,

'এই এক রকম। তুমি কেমন আছ?'

'ওঃ আমি ভালোই আছি; মায়ের অবস্থা বড় খারাপ।'

'তোমার মায়ের?'

'হাঁ, আমার মায়ের।'

'কি হয়েছে তার?'

'এবার আর টিঁকবে না, এই আর কি।'

জলের মধ্যে থেকে হাত তুলে নিতেই, নীলচে জল তার আঙুলের ডগা দিয়ে গড়িয়ে আবার নাদায় পড়তে লাগল। হঠাৎ-জাগা-কৌতুহলে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'বল কি! এমন হয়েছে?'

'ডাক্তার বলছে বিকেলটাও কাটবে না।'

'তাহলে ত হয়েই এসেছে।'

এইবার ত আসল প্রস্তাবটা করতে হবে; কিন্তু একটু ভূমিকা না ক'রে কি ক'রে পাড়া যায় কথাটা? কি ভাবে আরম্ভ করা যায়? কিছুই ঠিক করতে না পেরে সোজাই পেড়ে বসল কথাটা:

'শেষ সময় পর্যন্ত থাকবার জন্তে কত নেবে তুমি, এঁ্যা? আমাদের অবস্থা ত তুমি জান। একটা ঝি পর্য্যন্ত রাখতে পারি না। মায়ের প্রাণটা ত খেটে খেটেই বেরিয়ে গেল; একদণ্ড ফুরসুৎ পায় নি মা। বিরেনব্বুই বয়েস হলে কি হয়, মা একাই ছিল দশজন। ওরকমটি আজকাল আর পাবে না।'

রাপে মাসী গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে,

'আমার দু রকম দর আছে। বড়লোকের বাড়ী দিনে পাঁচ সিকে রাতে সাত সিকে। গরীবের বাড়ী দিনে দশ আনা রাতে পাঁচ সিকে। তোমার কাছ থেকে ঐ শেষের দরেই নেব।'

ওনোরে ভেবে দেখল যে নিজের মাকে সে যতদূর জানে তাতে সে যে হুট্ বলতেই ম'রে যাবে তা হবে না। বাঁচবার, রোগ সইবার শক্তি তার অসাধারণ। ডাক্তারে যাই বলুক, সপ্তাহ খানেক টিঁকে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই ঠিক ক'রে নিয়ে বলল,

না, না, তুমি আমার সঙ্গে ফুরণ ক'রে নাও। শীগ্‌গিরই হোক আর দেরীতেই হোক অসুবিধা দু দিকেই আছে। ডাক্তারে বলছে আর দেরী

নেই। তা যদি না-ই থাকে, তোমার সুবিধেই হল। আমার তাতে দুঃখই বেশী। আর আজকের দিনটা কি কালকে, কি আর একটু বেশী যদি বাঁচে তাহলে তোমার অসুবিধে হলেও আমার তাতে আনন্দ।'

রাপে মাসী আশ্চর্য হয়ে তাকাল তার দিকে। এ পর্য্যন্ত ফুরণে কেউ মরে নি তার হাতে। তাই লোভ হলেও ক্ষতির ভয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল। তারপরে তার মনে হল ঠকানোর চেষ্টা করছে না ত। সে বললে,

'তোমার মা-কে না দেখে বলতে পারি না।'

'তাহলে দেখবে চল।'

হাত দুটো পুঁছে নিয়ে তখনই ওনোরের পেছন পেছন আসতে লাগল সে; পথে একটা কথাও তাদের হল না। ওনোরে চলে লম্বা লম্বা পা ফেলে আর রাপে মাসী চলে দরবড়িয়ে। ওনোরে যেন প্রতি পদক্ষেপে একটা ক'রে খানা পার হচ্ছে এমনিই তার ভঙ্গী। তাপক্লান্ত গরুগুলো শুয়ে রয়েছে মাঠে। পাশ দিয়ে এরা যেতেই গরুগুলো মৃদু শব্দ করলে—যেন ঘাস চাইছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে ওনোরে বোঁতা বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলল,

'যদি এতক্ষণে হয়ে গিয়েই থাকে?'

তার অবচেতন আশা ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে।

বুড়ী কিন্তু মরে নি; চাকা লাগানো খাটে ছাপা লাল ক্যালিকোর লেপের ওপর হাত রেখে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। হাতদুটো ভীষণ রোগা আর গিঁঠোলো; বাতে, অশ্রান্ত খাটুনিতে আর প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী অবিরাম কর্ত্তব্য-পালনে বেঁকে গিয়েছে; দেখলে অস্বস্তি লাগে—কাঁকড়ার কথা মনে হয়।

বিছানার কাছে গিয়ে রাপে মাসী ভালো ক'রে দেখে নিল

মরণোন্মুখিনী বৃদ্ধাকে; নাড়ী টিপল, বুকে হাত দিয়ে দেখল; তারপরে শ্বাস ঠিক পড়ছে কি না দেখে নিয়ে গলায় ঘড়ঘড়ি উঠেছে কি না বুঝবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল দুই একটা প্রশ্ন। আরও একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ওনোরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। রাত্রি পর্য্যন্ত টি'কবে ব'লে মনে হয় না।

'তাহলে', জিজ্ঞাসা করল ওনোরে।

'হাঁ, যা দেখলাম তাতে দু'দিন কি তিনদিনও লেগে যেতে পারে; সবশুদ্ধ তোমার আমাকে চার টাকা দিতে হবে।'

ওনোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চার টাকা! বল কি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি তোমাকে বলছি পাঁচ-ছ ঘণ্টার একামনিট বেশী টি'কবে না।'

দু পক্ষে বেধে গেল তুমুল দীর্ঘ তর্ক। শেষ পর্য্যন্ত ধাত্রী যখন চলে যাবার ভয় দেখালে আর ওনোরেও দেখল গম তোলার সময় বয়ে যাচ্ছে তখন তার দরই স্বীকার করে নিল সে। গম ত আর আপনি আপনি ঘরে এসে উঠবে না:

'আচ্ছা বেশ চার টাকাই সই। কিন্তু ওতেই তোলা-টোলা সব ক'রে দিতে হ'বে—ঐ চার টাকার মধ্যেই।'

'হাঁ, তাতেই হবে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ছুটল মাঠের দিকে; প্রখর রোদ্দুরে গম কাটতে লাগল। রাপে মাসী করবার মত কিছু কাজ নিয়ে ফিরে এল ওনোরের বাড়ী। মৃত বা মুমূর্ষুর বিছানার পাশে বসেও সে কাজ ক'রে যায়—নিজের জন্যেও করে আবার রোগীর বাড়ীর লোকের জন্যেও করে; অবশ্য দু পয়সা বেশী দিতে হয় সে জন্যে। হঠাৎ সে বলে উঠল রোগিণীকে—

'মাদাম বোঁতাঁ, পুরুত ঠাকুর এসে তোমাকে নাম শুনিয়ে গিয়েছেন ত?'

মাদাম বোঁতাঁ মাথা নেড়ে বলল 'না'। রাপে মাসী ভারী ধর্মভীরু; তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বললে, 'বল কি! যাই, আমিই গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি পুরুত-ঠাকুরকে।

মাসী এমনিই ছুটে গেল যাজকের বাড়ী যে পাকে ছোট ছোট ছেলেগুলো ভাবল বুঝি গুরুতর কিছু ঘটেছে। পুরুত তখনই এল তার সামনে, গির্জার গায়ক-বালকদের একজনা এল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। প্রকৃতি তখন রোদ্দুরে ঝিমিয়ে পড়েছে। একটু দূরে মাঠে কর্মরত কয়েকজন যাজকের শাদা পোষাক চোখের আড়াল না হওয়া পর্যান্ত দাঁড়িয়ে রইল টুপী খুলে। একটা গোলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল পুরুতঠাকুর। মাঠে মেয়েরা গমের আটি বাঁধছিল; তারা সোজা হয়ে বাতাসে আঁকল ক্রুশের চিহ্ন। কালো মুরগী গোটা কয়েক এই শব্দে ভয় পেয়ে গর্ত্ত ডোবার ওপর দিয়ে পত পত ক'রে উড়ে, প'ড়ে, শেষে বেড়ার পরিচিত ফাঁক দিয়ে গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়ার বাচ্চা বাঁধা ছিল খুঁটিতে; সেও ভড়কে গিয়ে লাথি ছুঁড়ে খুঁটির চারিদিকেই ঘুরতে লাগল বন্ বন্ ক'রে। গায়ক বালকের পরনে লাল পোষাক আর যাজকের মাথায় চৌকো টুপী, দৃষ্টি অবনত, মুখে মৃদু প্রার্থনার মন্ত্র। পেছনে আসছে রাপে মাসী, মুখ নীচু ক'রে, কুঁজো হ'য়ে, যেন পুজো করতে করতে চলেছে। গির্জায় ব'সে আছে মনে ক'রেই বোধ হয় হাত দুটো জোড় ক'রে আছে।

দূর থেকে ওনোরে তাদের দেখে জিজ্ঞাসা করল মজুরকে, 'আমাদের পুরুত-ঠাকুর যাচ্ছে কোথায়?'

মনিবের চেয়ে চাকরের বুদ্ধি বেশী। সে বললে,

'তোমার মাকেই ত নাম শোনাতে আর শান্তির জল দিতে যাচ্ছে।'

ওনোরে বিস্মিত হল না;

'তাই হবে' বলে আবার কাজে মন দিল।

পুরুত এসে তার কাজকর্ম্ম সেরে চ'লে গেল। সেই দম বন্ধ হওয়া কুঁড়ে ঘরে ব'সে রইল দুটি স্ত্রীলোক। রাপে মাসী বুড়ীর দিকে তাকায় আর ভাবে, আর কতক্ষণ—মরতে বুড়ীর আর কতকক্ষণ লাগবে।

দিনের আলো নিভে আসছে—বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। ঘরে এসে ঢুকছে হালকা হাওয়া বারেবারেই। দেয়ালে ঝোলানো মস্ত ছাপা ছবি নড়ে নড়ে উঠছে। একদা শাদা কিন্তু এখন হলদে, জানলার ছোট ছোট পর্দায় অসংখ্য ছিটে ফোটা দাগ। ঐ বুড়ীর আত্মার মতই ওরা ছুটে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বাতাসে দুলছে প্রাণপণে।

মাদাম বোর্তো চোখ খুলে স্থির হয়ে শুয়ে যেন উদাস হয়ে প্রতীক্ষা করছে নিশ্চিত অথচ শ্লথগতি মৃত্যুর। তার গলা ঘড়্ ঘড়্ করছে, নিঃশ্বাসে শিস্ দেওয়ার মত শব্দ। এ নিঃশ্বাস থেমে যাবে একটু পরেই; পৃথিবীতে একজন নারী ক'মে যাবে; তাতে কারও কিছু আসে যাবে না।

গোধূলি বেলায় ওনোর ফিরে এল, বিছানার কাছে এসে দেখল তার মা তখনও বেঁচে আছে।

একটু শরীর খারাপ হলে যে ভাবে জিজ্ঞাসা করত সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করল মাকে, 'কেমন আছ?' পরের দিন ঠিক ভোর পাঁচটায় আসতে বলে রাপে মাসীকে ওনোরে বিদায় দিল। ঠিক ভোর বেলাতেই ফের এল বুড়ী ধাত্রী; ওনোরে তখন মাঠে বেরুবার আগে কিছু খেয়ে নিচ্ছে। খাবার অবশ্য নিজেই তৈরী করেছে।

রাপে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা ম'ল না কি?'

চোখ মিচ্‌কে ওনোরে বলল,

'একটু যেন ভালোর দিকেই যাচ্ছে।'

সে বেরিয়ে গেল মাঠে।

বড়ই অস্বস্তিতে মুমূর্ষুর একেবারে কাছে গিয়ে সে দেখল কাল যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে—লেপের ওপর হাত দুটো প'ড়ে, চোখ খোলা, অনড়, উদাসীন। রাপে মাসী দেখলে এই অবস্থায় ও দু দিন, চার দিন, এমন কি এক সপ্তাহও টিঁকে যেতে পারে। তার লোভী মন আশঙ্কায় ভ'রে উঠতেই সে ভীষণ চটে উঠল ঐ ঠগ, জোচ্চোরটার ওপর আর মাটি কামড়ে-প'ড়ে-থাকা বুড়ীর ওপর। যাই হোক, মাদাম্ বোঁতার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সে নিজের কাজে মন দিল। দুপুরে খেতে এল ওনোরে—তার চোখে সন্তোষের এমন কি বিদ্রূপের দৃষ্টি। আবার সে বেরিয়ে গেল। গম তার খুব ভালোই উঠেছে গোলায়।

রাপে মাসীর মেজাজ বিগড়োচ্ছিল। তার মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তটি তার চুরি হয়ে যাচ্ছে, যেন কে তার পয়সা চুরি ক'রে নিচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, উন্মাদ ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ শুকনি বুড়ীটার গলাটা টিপে শেষ ক'রে দিতে। বুড়ী কিছুতেই যদি মরবে—একেবারে গোঁ ধ'রে ব'সে রয়েছে। একটুখানি টিপুনি, ব্যস্; তাহলেই ঐ ছোট ছোট ক্ষিপ্র নিঃশ্বাস, তার টাকা-চুরি-করা নিঃশ্বাস থেমে যাবে। কিন্তু এতে যে বিপদ আছে একটু। অন্যান্য উপায় মনে এল তার। মুমূর্ষুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

'যমদূত দেখতে পাচ্ছ?'

'না', বললে মাদাম্ বোঁতাঁ।

মরণোন্মুখিনীর দুর্বল মনে যাতে ভয় লাগে এই রকম সব গল্প বলতে লাগল রাপে মাসী; বলল যে মরণের কয়েক মুহূর্ত্ত আগেই যমের পেয়াদারা দেখা দেয়: তাদের হাতে থাকে ঝাঁটা, মাথায় তিনটে শিঙ, মুখে বিকট চীৎকার। একবার তাদের দেখলে আর রক্ষে নেই; পৃথিবীর মেয়াদ এখনি ফুরোবে বুঝতে হবে। সেই বছর মরণের আগে

কে কে যমের পেয়াদা দেখেছে তা বুড়ীকে বলল রাপে মাসী ; যোসেফাইন্ লোয়াজেল, ইউলালী রাতিয়ের, সোফি পাদাগ্নো, সেরাফাইন্ গ্রস্পীদ। এ সবের ফল হল মাদাম বোঁতাঁর ওপর। সে ভীত হয়ে, হাত পা উস্‌খুশ ক'রে মাথা ঘুরিয়ে কেবলই ঘরের ওই কোণে তাকাবার চেষ্টা করতে লাগল।

রাপে মাসী হঠাৎ মশারির পেছনে বিছানার পায়ের কাছে লুকিয়ে আলমারি থেকে একখানি কাগজ নিয়ে জড়ালো নিজের দেহে ; কাগজের দুটো শিঙ্ পরল কানের ফাঁক দিয়ে আর একটা গুঁজে দিল কপালের ওপর চুলে। ডান হাতে একটা ঝাঁটা আর বাঁ হাতে একটা টিনের বালতি নিয়ে সেটাকে ঝনঝনিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপরে একটা চেয়ারে উঠে, মশারি তুলে দাঁড়াল রোগীর সামনে। অঙ্গভঙ্গী ক'রে, কাপড়ের তলায় চিঁ চিঁ চীৎকার শুরু করে দিল মুখ ঢেকে—ঠিক যেমন ছবিতে যমদূত আঁকা থাকে সেই রকম। মুমূর্ষু বৃদ্ধার সামনে তারপরে নাড়তে লাগল ঝাঁটা গাছটা। ভয়ে উন্মাদের মত হয়ে মাদাম বোঁতাঁ অমানুষিক চেষ্টা করল বিছানা থেকে উঠে কোন রকমে পালিয়ে যাবার। কাঁধ আর বুক তুলল কোন রকমে ; তারপরেই গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে প'ড়ে গেল বিছানায়। সব শেষ হয়ে গেল।

পরম প্রশান্তিতে জিনিষগুলো আবার যথাস্থানে রেখে দিল রাপে মাসী—ঝাঁটাটা ঘরের কোণে, কাগজটা আলমারির ভেতরে, বালতিটা মেঝের ওপর আর চেয়ারটা দেয়ালের গায়ে। তারপর যথারীতি তার ব্যবসার কাজ সুরু হল: মৃতার উদ্‌ভ্রান্ত চোখের পাতা নামিয়ে চোখ ঢেকে দিল ; পুরুতের রেখে যাওয়া শান্তির জলে এক পাত্র ভর্তি ক'রে রাখল বিছানার ওপর ; তার থেকে জল নিয়ে নিয়ে কফিনের পেরেকে ছুঁইয়ে দিল। দেরাজের ওপর রাখা ছিল কফিনটা। শেষে হাঁটুগেড়ে

ব'সে মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় গভীর প্রার্থনা আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রার্থনাটা রাপে মাসীর মুখস্থই ছিল। এটা তার ব্যবসার আঙ্গিক কি না।

সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে ওনোরে দেখল রাপে মাসী নতজানু হয়ে ব'সে রয়েছে। ওনোরে তখনই হিসেবে ব'সে গেল। তিন দিন এক রাত্তির থাকতে হয়েছে মাদাম রাপেকে—অর্থাৎ তার পাওনা হয় তিন টাকা ছ'আনা আর তাকে দিতে হচ্ছে চার টাকা।

দশ আনা পয়সার ক্ষেতি হ'ল, ভাবলে ওনোরে।

নিষিদ্ধ ফল

সমুদ্রতীরে প্রথম মনোরম দৃষ্টি বিনিময়ের পর বিয়ের আগে তারার আলোয় তারা আত্মিক প্রেম করছে। মেয়েটি খাসা; গোলাপের মত তরুণী চক্‌চকে ছাতা মাথায় দিয়ে, ধোয়া পোষাক প'রে সমুদ্রের পটভূমিকায় তার পাশ দিয়ে চলে যেত। অসীম আকাশের তলায় নীল সমুদ্রের পরিবেষ্টনীতে এই পেলব রূপসীকে সে ভালবেসেছিল। উড়তে না জানা এই নারী তার মনে যে সুকুমার ভাবটি জাগাল তার সঙ্গে কি রকম মিশিয়ে গেল, সমুদ্রের স্নিগ্ধ লবণাক্ত বাতাসে আর আলোয়-ঢেউ-এ তার সারা দেহে মনে জাগা অস্পষ্ট, তীব্র অনুভূতি। জৈবিক উত্তেজনা আর হৃদয়ের অনুভূতিতে জড়াপটুকি বেঁধে গিয়ে একাকার হয়ে গেল।

মেয়েটি তাকে ভালবাসলে লোকটি তাকে ভালোবেসেছে বলে, লোকটির পয়সা আছে বলে, যৌবন আছে বলে। তার ওপর তার স্বভাবটি ভদ্র, মার্জিত। মেয়েটি তাকে ভালোবাসলে কেননা তরুণীদের স্বভাবই হল মিষ্টিমুখ তরুণকে ভালবাসা।

তারপর তিন মাস তারা পাশাপাশি, চোখোচোখি, হাতাহাতি ক'রে রইল। নতুন দিনের স্নিগ্ধতায়, স্নানের আগে সকালে তাদের সুপ্রভাত জ্ঞাপন আর নিস্তব্ধ রাত্রে বালির ওপর নক্ষত্রের আলোর নীচে ধীরে আরও ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, ইতিমধ্যেই চুম্বনের মত লাগছিল, তবু এখনও তাদের ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেকে নি।

তারা ঘুমিয়ে এ ওকে স্বপ্ন দেখত, জেগে উঠে ভাবত পরস্পরের কথা; মুখে না বললেও একজনকে অন্য জন সমস্ত দেহ ও মন দিয়ে চাইছিল।

বিয়ের পরে তারা ভাবলে ও বুঝি আমার কাছে অমূল্য যত্ন। প্রথমে এল প্রবৃত্তির অক্লান্ত আবেগ ; তারপর মার্জিত অমার্জিত ছলা-কলা, সূক্ষ্ম আদর এবং রীতিমত কবিতায় ভরা একটা অপার্থিব স্নিগ্ধতা। তারপরে তাদের দৃষ্টিতে দেখা দিল মালিন্য ; সমস্ত অঙ্গভঙ্গীই স্মরণ করিয়ে দেয় রাতের আকুল মিলনকে।

তারপরে স্পষ্ট না বুঝলেও, স্বীকার না করলেও তারা বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে পড়ল। ভালো তারা বাসতই ; সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আর ত নতুন কিছু উদ্ঘাটন করবার নেই, এমন কিছু করবার নেই যা বহুবার করা হয় নি, কাউকে কারও কিছু শেখাবার নেই আর, না একটা প্রেমের কথা, না একটা নতুন ভঙ্গী অথবা কণ্ঠস্বর—কণ্ঠস্বর, যা বহুবার বলা কথার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ করে।

প্রথমদিকের আলিঙ্গনের সেই আবেগের শিখা আবার তারা চেষ্টা করল জ্বালাবার। প্রতিদিন নতুন কোন মজা, সহজ কিংবা জটিল কোন সাফাই, তারা আবিষ্কার করত প্রথম দিনের সেই অতৃপ্ত আবেগকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে, মধুচন্দ্রিকার সেই আগুন শিরায় শিরায় অনুভব করবার জন্যে।

কামনাকে এমনি ক'রে চাবুক মেরে মেরে মাঝে মাঝে তারা আবার একটু কৃত্রিম উত্তেজনায় ঘণ্টাখানেক উদ্বেল হয়ে উঠে আবার বিশ্রী অবসাদে ডুবে যেত।

রাতের মিষ্টতায় পত্রপুঞ্জের তলায় তারা চাঁদের আলোয় বেড়িয়ে দেখল, কুয়াসায় ঢাকা পাহাড়ের কবিতাও পড়ল, সাধারণ উৎসব আনন্দে যোগ দিয়ে দেখল—কিছুতেই কিছু হল না।

একদিন সকালে আঁরিয়েতা পল্‌কে বললে,

'চল না, একটা হোটেলে খেয়ে আসা যাক্।'

'বেশ ত, চল না।'

'বেশ বিখ্যাত একটা হোটেলে।'

'আচ্ছা।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পল্ তাকাল তার দিকে; বুঝল কিছু একটা মনে আছে অঁারিয়েতার, বলছে না।

অঁারিয়েতা বললে, 'সেই রকম একটা হোটেল,—কি ক'রে বোঝাই তোমাকে—একটা জঁাক-জমকভরা হোটেল যেখানে লোকে আসছে যাচ্ছে, কত দেখাশোনার ঠিক-ঠাক হচ্ছে।'

হেসে পল্ বললে, 'হাঁ বুঝেছি, বড় হোটেলে একটা আলাদা ঘরে ব'সে সকলের মাঝখানে অথচ একেলা?'

'হাঁ, হাঁ। কিন্তু তোমার পরিচিত হোটেল হওয়া চাই, যেখানে তুমি অনেকদিন রাতে খেয়েছ—মানে ডিনার খেয়েছ—মানে বলছি কি—না সে আমি বলতে পারব না!'

'বলেই ফেল না সখী; আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে, লজ্জা কি? আমরা ত অন্যদের মত পরস্পরের কাছে লুকোচুরি করি না।'

'না, না সে আমি বলতে পারব না।'

'কেন ন্যাকামি করছ? ব'লে ফেল, ব'লে ফেল।'

'আমার ভারি ইচ্ছে হয়—যাঃ আমি বলতে পারব না। আমি কি ভাবি জান? ভাবি, আমি যেন তোমার বউ নই। বেয়ারারা তাকাচ্ছে আমাদের দিকে—তারা জানে না তোমার বিয়ে হ'য়েছে। তুমিও তেমনি ভাববে আমাকে—এই ঘণ্টা খানেকের জন্যে। তোমার বহুদিনের প্রেম করব স্মৃতিতে ভরা জায়গাতেই ব'সে আমরা প্রেম করব। আমিও ভাবব তুমি আমার বর নও। বুঝেছ? আমি একটু পাপ করতে চাই, তোমাকে ঠকিয়ে অবৈধ প্রণয় ক'রতে চাই—তোমার সঙ্গেই। বড়

খারাপ লাগছে, না? কিন্তু কি করি বল, আমার যে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। এই, হেস না বলছি; ভারী লজ্জা লাগবে আমার। ভেবে দেখ দিকিনি তোমার সঙ্গে অপরিচিত, অবৈধ জায়গায় ব'সে খাচ্ছি—একলা হোটেলের এক ঘরে যেখানে লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রেম করে—যাঃ ভারী খারাপ। তাকিয়ো না বলছি আমার দিকে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠব এখনি।'

ভারী মজা লাগল পলের: সে হেসে বলল,

'আচ্ছা, যাব এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে আজকে—পরিচিত এক মনের মতন জায়গায়।'

সাতটা আন্দাজ বড় রাস্তার উপর এক হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে আঁরিয়েতা উঠছে কম্পিত, আনন্দিত হৃদয়ে, ঘোমটা প'রে—আর পল বিজয়ীর মত হাসতে হাসতে। একটা ছোট্ট ঘর—চারখানা আরাম-কেদারা আর একখানা লাল মখমলে মোড়া সোফা। সেই ঘরে তারা এসে বসতেই খানসামা খাবারের ফিরিস্তি দিল হাতে। পল্ সেটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল,

'কি খাবে বল।'

'আমি কি জানি? এখানে কি ভালো পাওয়া যায়?'

একজন বেয়ারার হাতে কোট খুলে দিতে দিতে পল্ ফিরিস্তিটা প'ড়ে গেল; তারপর বললে, 'এইগুলো দাও: বিস্ক সুপ্, চিকেন ডেভিল, খরার মাংস, আমেরিকান্ রান্না হাঁস, ভেজিটেব্ল্ স্যালাড্, আর ফলমূল। আর শ্যাম্পেন দিও।'

খানসামা মুচকি হেসে তরুণীর দিকে তাকিয়ে কার্ডটা নিয়ে নীচু গলায় বললে, 'মসিয়ে পল সরবৎ খাবে না শুকনো শ্যাম্পেন?'

'শুধুই শ্যাম্পেন।'

তার স্বামীর নাম লোকটা জানে দেখে খুসী হল আঁরিয়েতা। সোফার ওপর পাশাপাশি ব'সে তারা খাওয়া সুরু করলে।

ঘরে দশটা বাতি—প্রতিফলিত হচ্ছে প্রকাণ্ড আয়নার ওপর আয়নার স্বচ্ছ কাঁচের ওপর হীরে দিয়ে অসংখ্য নাম লেখায় মনে হচ্ছে মাকড়সায় যেন জাল বুনে দিয়েছে।

প্রথম গেলাস খাওয়ার পরেই মাথা ঘুরে উঠলেও আঁরিয়েতা গেলাসের পর গেলাস খেয়ে যাচ্ছে। কিসের সব স্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে বারে বারে পল্ চুমো খাচ্ছে তার হাতে। আঁরিয়েতার চোখে দীপ্তি।

এই সন্দিগ্ধ পরিস্থিতি তাকে অদ্ভুত নাড়া দিল, উত্তেজনায়, সুখে ভ'রে দিল; অবশ্য একটু কলঙ্কিতও মনে হল নিজেকে। দু জন গম্ভীর প্রকৃতির বেয়ারা, নির্বাক হয়ে ঢুকছে ঘরের মধ্যে একান্ত প্রয়োজন হলে; তারা সবই দেখতে অভ্যস্ত কি না। এরা ঘন হয়ে উঠতেই সন্তর্পণে আবার বেরিয়ে আসছে বেয়ারারা। আসছে যাচ্ছে বেগে অথচ নিঃশব্দে।

ডিনারের মাঝামাঝি আঁরিয়েতা একেবারে মাতাল হয়ে উঠল; পল, আনন্দাতিশয্যে, তার হাঁটুদুটো ধরে প্রাণপণে করল আলিঙ্গন। আঁরিয়েতার গাল লাল, চোখে উজ্জ্বল মত্ততা। নির্ভয়ে ব'কে চলল সে,

'পল, এইবার সত্যি ক'রে বল না। আমার সব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কি বলব, প্রিয়া।'

'সে আমি বলতে পারব না।'

'কিন্তু আমাকে তোমার বলতে—'

'আমার আগে আর ক'জনকে ভালো বেসেছ? অনেক না?'

একটু গোলমালে প'ড়ে দ্বিধা করতে লাগল পল্; নিজের প্রিয়া-ভাগ্য লুকোবে না তা নিয়ে গর্ব করবে।

আঁরিয়েত্তা অনুরোধ ক'রেই চলেছে 'বল না, বলই না আমাকে অনেকগুলো কি না?'

'এই জন কয়েক।'

'ক' জন?'

'তা জানি না। এ সব আবার গণে না কি কেউ?'

'তা হলে অগুণতি?'

'না, না, অত নয়।'

'বুঝেছি; অনেক আর কি?'

'হাঁ, অনেক।'

'কতগুলো, একবার বলই না। এই—'

'না, না, লক্ষীটি, মনে নেই আমার। কোন বছর বেশী কোন বছর কম।'

'বছরে আন্দাজ ক'টা ক'রে?'

'কখনও পঁচিশ তিরিশটা আবার কখনও চারটে পাঁচটা।

'বাব্বা! তাহলে সবশুদ্ধ এক শ'টারও বেশী যে।'

'ঐ রকমই হবে।'

'কি বিশ্রী!'

'কেন?'

'বিশ্রী নয়? এতগুলো মেয়েমানুষ! বাব্বাঃ। একঘেয়ে লাগল না? এক শ'টা মেয়েমানুষ, ছিঃ!'

আঁরিয়েত্তার বিশ্রী লাগায় আহত হল পল্; তাই এমন একটা উঁচুদরের ভাব ক'রে উত্তর দিল সে, যেন আঁরিয়েত্তা একটা বোকামি ক'রে ফেলেছে:

'তোমার কথার কোন মানেই হয় না। একশ' টা মেয়েমানুষ যদি বিশ্রী হয় তাহলে একটা মেয়েমানুষও বিশ্রী।'

'কিছুতেই না।'

'কেন?'

'কেন আবার! একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম হয়, কত গোপন প্রণয় হয়, মনের মিল হয়—সে একটা পবিত্র জিনিষ। অতগুলোর সঙ্গে ত শুধু হয় নোংরামি আর ঢলানি। পুরুষ মানুষেরা যে কি! ঐ সব নোংরা মেয়েগুলোর সঙ্গে—'

'নোংরা কে বললে? তারা খুব ছিম্‌ছাম।'

'ঐ ব্যবসাতে আবার ছিম্‌ছাম্ হওয়া যায় না কি?'

'ঠিক উল্টো বললে। ঐ ব্যবসায় ছিম্‌ছাম্ না থেকে উপায় নেই।'

'আ ছিঃ। কেবল পরপুরুষের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটানো। ঘেন্না লাগে না।'

'তা হলে ত, যে গেলাসে একজন চুমুক দিয়েছে সে গেলাসে আর একজনের খাওয়া উচিত নয়; তার ওপর গেলাসটা নিশ্চয়ই অত ভালো ক'রে ধোওয়া—'

'থাম। যাচ্ছেতাই ব'ক না।'

'তাহলে জিজ্ঞাসা করছ কেন আমার মেয়েমানুষ ছিল কি না।'

'বেশ তাহলে বল, তুমি যাদের রেখেছিলে তারা সবই কি কুমারী—এক শ'—টাই।'

'না, না, তা কেন হবে—কেউ বা অভিনেত্রী, কেউ বা মজুরণী, কেউ বা গিন্নী—'

'গিন্নীবান্নি কটি ছিল?'

'এই ছটি।'

'মোটে?'

'হাঁ।'

'তারা দেখতে ভালো ?'

'হাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কুমারীদের চেয়েও ?'

'না।'

'কাদের বেশী ভালো লাগত—কুমারীদের না পরিপকদের ?'

'কুমারীদের'

'ছি, ছি, কি ঘেন্না !......আচ্ছা, কুমারীদের ভালো লাগত কেন ?'

'পরিপকের প্রতি আমার তেমন মোহ নেই।'

'মা গো ! কী ভয়ানক, কী জঘন্য লোক তুমি। কিন্তু এমনি ক'রে একটা ছেড়ে আর একটা ভালো লাগে ?'

'বেশ লাগে।'

'খুব ভালো লাগে ?'

'হাঁ, খুব ভালোই ত লাগে।'

'আচ্ছা, কি মজা পাও এতে ? একজনা আর একজনার মত নয় ব'লেই কি তোমরা এমনি ভবঘুরে ?'

'একজনা আর একজনার মত ত নয়-ই।'

'মেয়েরা সব এক রকম নয় ? বল কি !'

'মোটেই একরকম নয়।'

'কোন বিষয়েই না ?'

'না, কোন বিষয়েই না।'

'অদ্ভুত ত ! কিসে তাদের প্রভেদ ?'

'সবেতেই।'

'দেহেতে পর্যন্ত ?'

'হাঁ, দেহেতেও।'

'সারা দেহেই তফাৎ।'

'সারা দেহেই।'

'আর কিসে তফাৎ?'

'কিসে? সবেতেই—এই আলিঙ্গনের ধরণে, কথা বলার ভঙ্গিমায়, এমন কি অতি ছোটখাটো বিষয়েও।'

'তা হলে ত এই মেয়ে পরিবর্ত্তন ভারী মজার?'

'তা ত বটেই।'

'আচ্ছা, পুরুষেরাও তাহলে সব একরকম নয় ত?'

'তা আমি কেমন ক'রে জানব।'

'তুমি জান না?'

'না।'

'নিশ্চয়ই তারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের।'

'সে ত হ'তেই হবে।'

এক গেলাস শ্যাম্পেন হাতে নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে রইল আঁরিয়েতা। ভরা ছিল গেলাসটা; সেটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে, দুই হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে মুখে মুখ দিয়ে বলল,

'উঃ, কী ভালোই বাসি তোমাকে।' পল্ তাকে জড়িয়ে ধরল তৃপ্তিহীন আলিঙ্গনে।

বেয়ারা ঢুকতে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে স'রে এল। মিনিট পাঁচেক খাবার দাবার দেওয়া রইল বন্ধ।

গম্ভীর, অভিজাত ভঙ্গিতে আবার যখন খানসামা ফলমূল নিয়ে ঢুকল তখন আঁরিয়েতা আঙ্গুলে শ্যাম্পেনের গেলাস ধ'রে, সেই হলদে স্বচ্ছ তরল পদার্থের তলায় কি সব অজানা জিনিষের স্বপন দেখতে দেখতে চিন্তাময় কণ্ঠে আপন মনেই বলল,

'নিশ্চয়, খুইব মজার ত বটেই।'

মিস্ হ্যারিয়েট্

আমরা সাতজনা যাচ্ছি একটা ঘোড়ার গাড়ীতে—তিনজন মেয়েমানুষ, চারজনা পুরুষমানুষ; তার মধ্যে একজন বসেছে গাড়োয়ানের পাশে কোচ-বাক্সে। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে আঁকাবাঁকা রাস্তা; আমরা চলেছি মন্থর গতিতে।

তাঁকাভিলের ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্যে সকালবেলা বেরিয়েছি এত্রেতা থেকে; সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ থেকে ঘুম ছাড়ছে না। বিশেষ ক'রে যে সব মেয়েদের এই রকম প্রভাতী অভিযানের অভ্যাস নেই তারা কেবল চোখ পিট্‌পিট্ করছে, ঢুলছে আর হাই তুলছে; সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য তাদের চোখেই পড়ছে না।

ঋতুটা হেমন্ত; পথের দুধারে শূন্য ক্ষেতে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত গম গাছের হলদে গোড়ায় ভরা। ফোঁপরা মাটি থেকে যেন ভাপ উঠছে। আকাশে বহু উঁচুতে, ভরত পাখীর কলস্বরে মিশে যাচ্ছে নীচের ঝোপে ঝাড়ে পাখীর কাকলি।

সামনেই সূর্য উঠল, লাল হয়ে উঠল দিগন্ত। ক্ষণে ক্ষণে সূর্য যত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল, সদ্য নিদ্রোত্থিত শুভ্র-বসনা তরুণীর মত গ্রামগুলিও ধীরে ধীরে জেগে, স্মিতহাস্যে যেন আলস্য ত্যাগ করতে লাগল হাত পা ছড়িয়ে। কোচবাক্স থেকে কাউন্ট্ দে'ত্রাই চেঁচিয়ে উঠলেন,

'একটা খরা, একটা খরা!' বাঁ হাতি একটা বেড়ার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। মাঠের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে শুধু বড় বড় কান দুটি দেখিয়ে শশকশিশু দিলে ছুট। একটু ঘুরে একটা গভীর চাকার দাগ পার হয়ে, একটু থেমেই আবার চলতে লাগল আপন সহজ পথে; কোথায় কি বিপদ হয় এ জন্যে শিশুটি সদা সতর্ক—পথ বদলাচ্ছে, থামছে, কখনও

ঠিকই করতে পাচ্ছে না কোন্ পথে যাবে। হঠাৎ পেছনের পা উঁচু ক'রে তড়াং তড়াং ক'রে লাফ দিয়ে বীট গাছের ক্ষেতের মধ্যে একেবারে লুকিয়ে পড়ল। সবাই সজাগ হয়ে দেখছিল জন্তুটার গতিপথ।

রেণে লেমানয়ের তখন ব'লে উঠলেন,

'আজকে কি রকম মিইয়ে গিয়েছি আমরা। প্রতিবেশী স্তেরেণের ব্যারণেস্ কেবলই ঢুলছেন দেখে তাঁকে বলল নীচু গলায়,

'আপনি আপনার তিনির কথা ভাবছেন ত? নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি শনিবারের আগে ফিরছেন না। এখনও চার দিন দেরী।'

নিদ্রালু হাসিতে ব্যারণেস্ উত্তর দিলেন,

'আপনি কি অভদ্র!' ঘুম ঝেড়ে ফেলে অনুযোগ করলেন,

'কেউ এইবার একটা হাসির গল্প বলুন দেখি। মঁসিয়ে শেনাল্ আপনি ত শুনি ডিউক অব্ রিশ্লুর চেয়েও বড়লোক। একটা গল্প বলুন ত শুনি, নিজের জীবনের গল্প।'

লেও শেনাল্ বৃদ্ধ চিত্রকর। এককালে তাঁর দেহে সৌন্দর্য এবং শক্তি দুই-ই ছিল। তা নিয়ে তিনি সেকালে গর্বও ক'রে বেড়িয়েছেন। কিন্তু জন রঞ্জনতা আছে শেনালের। লম্বা শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু ভেবে নিয়ে মুচকি হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন:

'মহিলাবৃন্দ, গল্প শুনে কিন্তু হাসি পাবে না। যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা আমার জীবনের করুণতম প্রেমের কাহিনী। মনে হয় আপনাদের কারও জীবনে এমনটি ঘটে নি।'

১

'তখন আমার বয়স পঁচিশ; নোর্মাদির তীরভূমি দিয়ে রঙিয়ে রঙিয়ে চলেছি—অর্থাৎ কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুধাবন করার অছিলায় ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্ছি। এই

রকম যথেচ্ছ নিরুদ্বেগ ঘুরে বেড়ানো,—অবাধ, দায়িত্বহীন,—এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতেই নেই—কালকে কি হবে তার ভাবনাও থাকে না মনে। যেদিকে মন চায়, যেদিকে দু'চোখ চায় সেই দিকেই চল। সামনে এক ছুটে-চলা পার্বতী নদী কি কোনো সরাইখানার আলুভাজার গন্ধ থামিয়ে দিল গতি, মুগ্ধ হয়ে গেলে। কখনও ক্লিমাটিসের সৌগন্ধ বা সরাইখানার পরিচারিকার সরল দৃষ্টিই তোমার গতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট। এই সব পাড়াগেঁয়েদের প্রতি আমার আসক্তি দেখে যেন নাক সিঁটকোনা। পাড়াগেঁয়ে হলে কি হয়, এদের হৃদয়ও আছে ভালোবাসতেও জানে; তাছাড়া গালও ঝুলে পড়া নয়, ঠোঁটও মধুহীন নয়। তাদের অকৃত্রিম চুম্বনে বুনো ফুলের মদিরতা! প্রেমের দাম ত সব জায়গাতেই আছে হে। তুমি এলে একটি হৃদয় কেঁপে ওঠে, তুমি চলে গেলে দুটি চোখে জল পড়ে —এ জিনিষ এত বিরল, এত মধুর, এত অমূল্য যে একবার পেলে ফেলে দেওয়া কিছুতেই যায় না।

'আমি ত রাস্তার ধারের গর্তে, দিনের তাপে ভাপ-ওঠা খড়ের গাদার তলায় যেখানে সেখানে মিলনালাপ জমিয়েছি। মনে পড়ে নড়বড়ে বেঞ্চির ওপর খস্‌খসে ক্যাম্বিশ পাতা, সেইখানেই ঝ'রে পড়েছে আমার ওপর অকৃত্রিম, অবাধ, স্নিগ্ধ চুম্বনের রাশি তার পেছনে যে হৃদয় দেখেছি সে তোমাদের সহরের আলোকপ্রাপ্ত, মোহিনীর মধ্যে পাবে না।

'কিন্তু এই সব বিচিত্র অভিযানের মধ্যে সব চেয়ে কি ভালো লাগে জান? ভালো লাগে বন, সূর্যোদয়, গোধূলি, চাঁদের আলো। শিল্পীর পক্ষে এগুলি হল মধু-চন্দ্রিকা উদ্‌যাপন। সেই নিস্তব্ধ, দীর্ঘ মিলনে কোন ব্যাঘাত নেই: বুনো আফিম ফুল আর মার্গুয়েরাইটের মধ্যে খোলা মাঠে শুয়ে পড় চোখ মেলে, দেখ সূর্যাস্ত, দূরে ছোট গ্রামের ঘড়ির মিনার—সেখানে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজে।

'প্রাণের গন্ধে ভরা, সতেজ পেলব গুল্মে ঘেরা ওক গাছের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া ঝর্ণার পাশে ব'সে পড়। নতজানু হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে নাক গোঁফ ভিজিয়ে স্বচ্ছ জল খাও অঞ্জলি ভ'রে—মনে হবে যেন চুমু খাচ্ছ ঝরণার ঠোঁটে এত তীব্র সে অনুভূতি। ঝরণার গতিপথে মাঝে মাঝে গভীর গর্ত। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ডুব দাও তাতে—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত হিমশীতল, স্নিগ্ধ আদরে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে—শিরায় শিরায় অনুভব কর স্রোতের কোমল সুন্দর ছন্দ।

'পাহাড়ের ওপরে তুমি খুশী, জলার ধারে তুমি বিষন্ন, রক্তবর্ণ ছায়ার সমুদ্রে ভূষিত সূর্যের সামনে তুমি উদার আবেশে দেখ নদীর জলে রঙের প্লাবন। তারপরে রাতে আকাশের ওপর স্নিগ্ধগতি চাঁদের তলায় কত সব অদ্ভুত কল্পনা তোমার মাথায় আসে, যার তুমি দিনের আলোয় কোন সন্ধানই পাও না।

'এই যে প্রদেশ দিয়ে চলেছি এই প্রদেশ দিয়ে যেতে ইর্পোত আর এত্রেতার মাঝখানে ফালেজ নদীর ওপর বিনুভিল্ গ্রাম। খাড়া, এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাহাড়ে ভরা সমুদ্রতীর ধরে আমি কেকান্ থেকে আসছি। কার্পেটের মত মসৃণ ছাঁটা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি সকাল থেকে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে, মুখে গলা-ছেড়ে-দেওয়া গান; কখনও তাকাচ্ছি নীল আকাশে, মন্থর অলসগতি শাদা পাখা ছোট ছোট সামুদ্রিক চিলের দিকে, কখনও সবুজ সমুদ্রের দিকে অথবা বাদামী-পালওয়ালা মাছ ধরা নৌকার দিকে। এক কথায় বলতে গেলে দিনটা আমার খুশীতে, খেয়ালে, স্বাধীনতায় খাসা কেটেছে।

'একটা ছোট গোলাবাড়ী, সরাইখানারই মত—কর্ত্রী এক চাষী স্ত্রীলোক। তার চারিদিকে দু'সার বীচগাছ এবং মস্ত উঠোন। সেইটে আমায় একজনা দেখিয়ে দিলে।'

'ফালেজের তীর ছেড়ে, গাছে ঘেরা গ্রামে ঢুকে গিয়ে উপস্থিত হলাম মাদাম লেকাশূরের সরাইখানায়।'

'মাদাম লেকাশূর বৃদ্ধা, রুক্ষ চাষী স্ত্রীলোক—গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। নতুন খদ্দের এলে যেন অবজ্ঞাভরে জায়গা দিত।

'মে মাস। মাঠের ওপর মানুষের ওপর নির্বিচারে ঝরে পড়ছে অজস্র আপেলের ফুল—উঠোন ভ'রে গিয়েছে একেবারে। আমি বললাম,

"একটা ঘরটর পাওয়া যাবে, মাদাম্ লেকাশূর ?"

'আমার মুখে নিজের নামে বিস্মিত হয়ে সে উত্তর দিলে, "দেখি ; সব ঘরই প্রায় ভাড়া হয়ে গিয়েছে।"

মিনিট পাঁচেকেই আমাদের ভাব হয়ে গেল। একটা মাটির ঘরের শূন্য মেঝের ওপর আমার থলিটা নামিয়ে দেখলাম ঘরে একখানা চৌকি, দুখান চেয়ার, একখান টেবিল আর একটা হাতমুখ ধোবার পাত্র রয়েছে। পাশেই মস্ত ঝুলে ভরা রান্নাঘর—সেখানে চাষী কর্ত্তার সঙ্গে সব অতিথি ব'সে আহার করে, ক্ষেতের লোকেরাও বাদ যায় না। কর্ত্তা মৃতদার।

হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়বার সময় দেখি বৃদ্ধা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে একটা মুরগী খাবারের জন্তে তৈরী করছে। পাশে কালি-ঝুলি মাথা একটা কড়াই ঝুলছে।

বলে বসলাম, "এখন তাহলে পর্যটক খদ্দের বেশ আসছে ?"

একটু ক্ষুব্ধস্বরে সে উত্তর দিলে,

"একজন প্রবীণ ইংরেজ মহিলা আমার অতিথি। ঐ পাশের ঘরেই থাকেন।"

'দিনটা ভালো থাকলে বাইরে উঠোনে ব'সে খাবার জন্তে দু পয়সা ক'রে বেশী দিতে হত। তখন টেবিল পড়ত দুয়োরের সামনে আর আমি

নোম্যাদির রোগা মুরগীর ঠ্যাং-এর সঙ্গে খেতাম চার দিনের বাসি রুটী, আর পরিষ্কার সাইডার।

'বড় রাস্তার ওপরের ঝাঁপটা সরিয়ে হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যক্তি দেখি এগিয়ে আসছে বাড়ীর দিকে। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত রোগা, অত্যন্ত লম্বা গায়ে একখানা লাল-পাড় স্কচ গায়ের কাপড়। কোমরের নীচে দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে ছাতা ধরে না থাকলে মনে হবার কোন কারণ নেই যে মেয়েলোকটির হাত আছে। মুখ ত নয় যেন মমি; তার ওপর সসেজ-এর পাটের মত শাদা পাট করা চুল প্রতি পদক্ষেপে দুলে দুলে উঠছিল। দেখে আমার কেন জানি না, মনে হচ্ছিল কাঠির ডগায় শনের নুড়ি উড়ছে। চোখ নীচু ক'রে আমার সামনে দিয়ে সে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল।

'এই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি বড় কৌতূহল জাগালো মনে। ভাবলাম আমার পাশের ঘরে ইনিই নিশ্চয়ই সেই প্রবীণ ইংরেজ মহিলা।'

'সেদিন আর তার দেখা পেলাম না। পরের দিন এত্রেতা পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর উপত্যকাটির প্রান্তে ব'সে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ চোখ তুলেই দেখি উপত্যকার শীর্ষে বিচিত্র পোষাক পরা এক মূর্তি—দূর থেকে মনে হয় একটা বাঁশে কতকগুলো নিশেন ঝোলানো। আমাকে দেখেই মূর্তি অন্তর্হিত হল। দুপুর বেলা ফিরে এসে, সেই মূর্তির বৃদ্ধা অধিকারিণীর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছায় সকলের সঙ্গে একই টেবিলে খেতে বসলাম কিন্তু আমার আগ্রহের প্রতি সে লক্ষ্যই করল না, আমলেই আনল না আমার পরিচয়েচ্ছা। সযত্নে তাকে কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিলাম, অতি আগ্রহে এগিয়ে দিলাম খাবারের ডিস—প্রতিদানে এল একটু অদৃশ্যপ্রায় মাথানাড়া আর এক আধখানা অতি মৃদু ইংরেজী কথার টুকরো। সে কথা আমার কানেই পৌঁছাল না।

'মনে একটু নাড়া দিলেও তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমি ছেড়ে ছিলাম ; দিন তিনেকের মধ্যেই এই ইংরেজ মহিলার সম্বন্ধে মাদাম্ লেকাশূর যা জানে সেটুকু আমারও জানা হয়ে গেল।

'মহিলাটির নাম মিস্ হ্যারিয়েট্। গ্রীষ্মবাসের জন্যে একটা নির্জন গ্রাম খুঁজতে খুঁজতে মাস ছয়েক আগে বিনুভিল্ এসে আর চ'লে যাবার তেমন গা দেখাচ্ছে না। খাবার সময়েও তার হাতে প্রটেস্ট্যাণ্ট্ ধর্ম্মমতের প্রচার সম্বন্ধীয় একটা ছোট বই দেখা যেত ; সে তাড়াতাড়ি খেত আর পড়ত ; কারও সঙ্গে কথা বিশেষ বলত না। বই-এর একখানা ক'রে কপি প্রত্যেককে দিয়েছিল। চার পয়সা কমিশন্ কবুল ক'রে এক ছোঁড়ার হাতে দিয়ে এখানকার পুরুতকে পর্যন্ত কম সে কম চারখান: বই পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের সরাইখানার গিন্নীকে সে কোনোখানে কিছু নেই, হঠাৎ বলে উঠত,

"যীশুই আমার একমাত্র ভালোবাসার পাত্র ; সমস্ত সৃষ্টিতে, সমস্ত প্রকৃতিতে আমি তাঁকেই পূজা করি। আমার হৃদয়ে তিনি সব সময় বিরাজ করছেন।"

'আর সঙ্গে সঙ্গেই একখানা বই-এর উপহার। সারা পৃথিবী ঐ একখানি বই-এর জোরে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হবে।

গ্রামে কেউ তাকে দেখতে পারত না। ইস্কুলের মাষ্টার মশাই প্রচার করে দিয়েছিল মহিলাটি নাস্তিক। ওর নামেই কেমন দোষ হয়ে গেল। পুরুত বলেছিল মাদাম লেকাশূরকে,

"ও বিধর্মী ব'লেই ভগবান যে ওকে মেরে ফেলবেন তা ত হয় না। তা তিনি মারেন না। তা ছাড়া মহিলাটির স্বভাব চরিত্র ভালো।"

'বিধর্মী, নাস্তিক, এ সব কথা ত ভালো নয়। স্পষ্ট মানে না বুঝলেও লোকের মনে সন্দেহ হয়। লোকে বলল, মেয়েমানুষটার পয়সা আছে

কিছু ; বাড়ীর লোকেরা ওকে পরিত্যাগ করায় ও দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। নিজের পরিবার ওকে পরিত্যাগ করল কেন? নাস্তিক ব'লে। এ ত সোজা কথা।

'আসলে মহিলাটি ইংলণ্ডেরই একটী বিচিত্র সৃষ্টি : খুব উঁচু ধরণের, পরমত-অসহিষ্ণু, গোঁড়া সনাতনী। ইংলণ্ডে এ ধরণের জীব পাইকেরি ওজনে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইনি সেই জাতীয় অসহ্য ভালো মহিলা যারা ইউরোপের হোটেলে হোটেলে হানা দিয়ে বেড়ায়, ইতালীর সৌন্দর্য-নাশ করে, সুইজারল্যাণ্ডকে বিষায়িত করে, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সহরগুলোকে বাসের অযোগ্য ক'রে তোলে। সব জায়গায় বহন ক'রে নিয়ে যায় নিজেদের অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি আর আড়ষ্ট কুমারী-পনা আর অবর্ণনীয় প্রসাধন। ওদের গা দিয়ে যেন রবারের গন্ধ বেরোয় ; মনে হয় রাতে ওরা রবারের খাপ পরে থাকে। মাঠে মানুষের মুখ চোখ আঁকা কেলো হাঁড়ি দেখলে পাখী যেমন পালায় ওদের দেখলে আমি তেমনি করি।

'কিন্তু এই মহিলাটি এমন অসাধারণ যে আমার সে রকম পালানে-ভাব মনে জাগল না, এমন কি, খারাপই লাগল না।'

যা কিছু গ্রাম্য নয় তার প্রতিই মাদাম লেকাশূরের একটা সহজাত শত্রুতা আছে। এই বৃদ্ধা মহিলার বিদ্ঘুটে বাড়াবাড়িতে তার সঙ্কীর্ণ মন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠত। কেমন ক'রে জানি না, একটা কথা মাদাম্ লেকাশূর আবিষ্কার করেছিল যাতে তার মনের ঘৃণা ঠিক প্রকাশ পেত। মনের একান্ত ক্ষোভে এটা তার আকস্মিক আবিষ্কার। মহিলাকে সে বলত, 'মাগী একটা পিচাশ' (পিশাচের বিকৃত রূপ)। রুক্ষ সরল কৃষাণীর মুখে কথাটা শুনলেই আমার হাসি পেত। আমিও মহিলাটিকে দেখলেই ঐ কথাটা উচ্চারণ ক'রে একটা অদ্ভুত আনন্দ পেতাম।

'আমি মাদাম লেকাশূরকে জিজ্ঞাসা করতাম, "আজকে পিচাশ কি করছে ?' সন্ত্রস্ত হওয়ার ভাণ ক'রে সে উত্তর দিত,

"কি আর বলব ম'শায় ? একটা পা-ভাঙ্গা কটকটে ব্যাঙকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পুঁছে তাকে পোষাক-আশাক পরিয়ে রেখে দিয়েছে মানুষের মতন ! এর নাম যদি পিচাশ-গিরি না হয় ত, পিচাশ বলে কাকে ?"

'আর একবার ফালেজের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তখুনি-ধরা একটা মাছ কিনে আবার সেটাকে ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল। জেলেটা দাম পেয়েছিল যথেষ্ট তবু সে ভীষণ চটে গিয়েছিল। তার পকেট কেটে নিলেও বোধ হয় সে অত চটত না। তারপরে অন্তত একমাস ঘটনাটার কথা উল্লেখ করলেই সে রেগে আগুন হয়ে বলত, "যাচ্ছেতাই ব্যাপার মশাই। আর বলবেন না। মাদাম লেকাশূর যে ওকে পিচাশ বলে সে ঠিকই।"

'সহিস সাপ্যুরের বয়েস কম—সে আফ্রিকায় যুদ্ধ করেছে। তার আবার অন্য রকমের বিতৃষ্ণা মহিলাটির ওপর। সে বদমায়েসী ক'রে বলত, "ঐ শুকনিরও ম'শায় বয়েসকাল ছিল। আমরা ও-সব বুঝি।" বেচারী মিস্ হ্যারিয়েট্ যদি শুনতে পেত !

'ছোট্ট স্নেহশীলা সেলেস্ত্ কখনও ইচ্ছে ক'রে মিস্ হ্যারিয়েটের কাজ করত না। কেন বুঝতাম না। বোধ হয় ভিন্ জাত, ভিন্ ভাষা, ভিন্ দেশ এবং বিধর্মী ব'লে। তার কাছে মিস্ হ্যারিয়েট্ সত্যিই পিচাশ।

'প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে খুঁজে পূজো ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াত সে। একদিন দেখি এক ঝোপের মধ্যে সে নতজানু হয়ে ব'সে। পাতার ফাঁক দিয়ে লাল মত কি একটা দেখে ডাল পালা সরাতেই মিস্ হ্যারিয়েট্ তড়াক্ ক'রে উঠে পড়ে, অপ্রতিভ হয়ে, দিনের বেলায় শিকারে ব্যাহত বন-বেড়ালের মত তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।'

'পাহাড়ের মধ্যে ব'সে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি ক্যালেজের তীরে সিগ্‌ন্যালের মত দাঁড়িয়ে মিস্ হ্যারিয়েট্ রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের দিকে আর রক্তাভ অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কখনও দেখি ইংরেজী চালে লম্বা লম্বা পা ফেলে একটা গলির অই প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে; এগিয়ে যাই কিসের মোহে? তার দীপ্ত মুখমণ্ডলের, অন্তরের গভীর আনন্দে উদ্ভাসিত তার শুকিয়ে-যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মোহে?'

'কখনও দেখতাম সে মাঠের এক কোণে আপেল গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে আছে আপন মনে; কোলের ওপর ছোট্ট বাইবেলখানা খোলা।'

'স্নিগ্ধ, বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর হাজারো বাঁধনে এমনি বাঁধা প'ড়ে গেলাম যে কিছুতেই আর নিজেকে সেই শান্ত পরিবেষ্টনী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। এখানে আমি যেন পৃথিবীর বাইরে। সব কিছু থেকে দূরে; কাছে আছে শুধু মাটি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্যে ভরা সবুজ মাটি। আর এ কথাও কি স্বীকার করতে হবে যে কৌতূহল ছাড়াও একটু কিছু আমাকে ধ'রে রাখছিল মাদাম লেকাঁশূরের বাড়ীতে। এই অদ্ভুত মিস্ হ্যারিয়েটের সঙ্গে আমি একটু পরিচিত হ'তে চাই; জানতে চাই ঐ সঙ্গীহীন পর্যটক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলাগুলোর হৃদয়ে কিসের আনাগোনা।

২

'আমাদের পরিচয় হল অদ্ভুতভাবে। একটা ছবি সদ্য শেষ করেছি— মনে হচ্ছে ছবিটায় প্রতিভা এবং শক্তির পরিচয় আছে। পরিচয় ছিল সত্যই; তা না হলে পনের বছর পরে সেটা ছ'হাজার টাকায় বিক্রী হত

না। খুব সাধাসিধে ছবি, দুই আর দুই-এ চার-এর মত সোজা। অঙ্কন-বিস্তার কঠিন বিধিনিষেধের বালাই ছিল না ছবিটায়। ছবির ডান দিক ব্যেপে বাদামী, হলদে, লাল সামুদ্রিক শ্যাওলায় ভরা একটা পাহাড়ের গায়ে তেলের ধারার মত সূর্য কিরণ এসে পড়েছে। পটভূমিকায় তারাগুলি আলোয় লুপ্ত। রোদ্দুরে পাথর হয়েছে সোনা। ব্যস, আর কিছু নয়। চোখ-ঝল্সানো আলোর মহনীয়তা ফোটাবার সেই প্রথম নির্বোধ প্রচেষ্টা।

'বাঁ দিকে সমুদ্র—নীল নয়, পাথর রঙা নয়; সবুজে, দুধোলো সমুদ্র মেঘে ভরা আকাশের মত ঘন।

'এঁকে আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে স্রেফ নাচতে নাচতে ছবিখানা নিয়ে সরাইখানায় ফিরে এলাম। সারা পৃথিবীকে যদি একই মুহূর্তে ছবিখান দেখাতে পারতাম! পথের ধারে একটা গরু চরছিল; মনে পড়ে ছবিটা তার চোখের সামনে ধ'রে ব'লেছিলাম, "দেখে নে, দেখে নে, বুড়ী সুন্দরী! জীবনে আর এ রকম দেখতে পাবি না!"

বাড়ীর সামনে পৌঁছেই আমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম, "মাদাম্ লেকাশুর, মাদাম্ লেকাশুর, শীগ্গির্ এস, দেখে যাও।"

'কৃষাণী এগিয়ে এসে নির্বোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে, বোধ হয় বুঝলও না ছবিটা ষাঁড়ের কি ঘোড়ার।

'হাত বাড়িয়ে ধ'রে ছবিটা যখন সরাইউলীকে দেখাচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে মিস্ হ্যারিয়েটের প্রবেশ। ছবিটা ইচ্ছে ক'রেই এমন ক'রে ধরে ছিলাম যে 'পিচাশের' সেটা না দেখে উপায় ছিল না। সে ঝপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল নিস্পন্দ বিস্ময়ে। যে পাহাড়টার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নির্বাধে সময়ের সমুদ্র স্বপন দেখে পাড়ি দেয় এ যে সেই পাহাড়টাই।

'মিস্ হ্যারিয়েট শুধু বলল, "ওঃ"। সেই ধ্বনির তীব্রতায় খুসী হয়ে উঠে আমি হেসে তাকালাম তার দিকে, বললাম,

"এইখানি আমার শেষ ছবি, মাদ্‌মোয়াজেল্।"

তার উল্লাসে, তার কোমলতায় হাসি পেল আমার,

"ওঃ ম'সিয়ে, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা কাকে বলে আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন।"

'লাল হয়ে উঠলাম আমি। কোনো রাজরাণীর মুখ থেকে এ কথা শুনলে আমার এত আনন্দ হত না। আমি মুগ্ধ, পরাজিত, বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম। সত্যি বলছি, তখন আমি তাকে আলিঙ্গন করতে পারতাম।'

'অভ্যাসমত টেবিলে তার পাশেই বসলাম। এই প্রথম সে কথা বলল, টেনে টেনে,

'এত ভালোবাসি আমি প্রকৃতিকে!'

'একটু মদ এগিয়ে দিতেই মমির মুখের শূন্য হাসি দিয়ে সে আমার এগিয়ে-দেওয়া জিনিষ এইবারে গ্রহণ করল। ছবিটা নিয়ে শুরু হল কথাবার্তা।

'খাওয়ার পর টেবিল থেকে উঠে আমরা উঠোনে পদচারণা করতে করতে সমুদ্রের ওপর অস্তমান সূর্যের দীপ্ত আভা পড়েছে দেখে ফালেজের ধারের বেড়াটা খুলে দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলাম—এই প্রথম দুজনে দুজনকে বুঝতে শিখে পরম তৃপ্তিতে এগিয়ে চললাম।

'কুয়াসাচ্ছন্ন, শিথিল-করা সন্ধ্যা; দেহ-মন খুসী হয়ে ওঠে। সব কিছু আনন্দ, সব কিছু সুন্দর। বুনো ফুলে আর শষ্প-গন্ধে মন্থর, রসাল, স্নিগ্ধ বাতাস যেন অন্তরে প্রবেশ ক'রে আদর করে। বিশাল সমুদ্রের তীরপ্রান্তে উৎরাই-এর ধারেই এসে দাঁড়িয়েছি আমরা—একটু দূরেই গড়িয়ে চলেছে সাগর।

'ঢেউ-এর ছোঁয়ায় লবণাক্ত বাতাস ধীরে ধীরে চলে যায় গায়ের ওপর দিয়ে ; আমরা বুক ভ'রে নিশ্বাস নিই।

'স্নিগ্ধ বাতাসে গায়ের কাপড়ের তলায় শিউরে উঠে, দাঁতে দাঁত চেপে ইংরেজ রমণী চুপ ক'রে তাকিয়েছিল সমুদ্রের দিকে নেমে আসা বিরাট সূর্য-গোলকের দিকে। দিক্‌প্রান্তে একটা জাহাজের পেছনে সূর্য্য স্পর্শ করল সমুদ্রের জল, ধীরে ধীরে ডুবে গেল জলে। দেখলাম কেমন ক'রে ডুবে গিয়ে, ক্ষয়ে গিয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল।

'আবেগভরে দেখতে লাগল মিস্ হ্যারিয়েট দিনমণির শেষ কম্পমান কিরণচ্ছটা।

'আপন মনে বলল সে: "ভালো—ভালোবাসি আমি…" ; চোখে একফোঁটা জল। বলে চলল, "যদি পাখী হ'তাম, যদি উড়ে যেতে পারতাম আকাশে!"

'অন্যদিনের মত লাল আলোয় তার লাল শালের মতই রক্তিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে সমুদ্রতীরে। ইচ্ছে হল তার একটা ছবি এঁকে নিই। একটা অপূর্ব্ব ব্যঙ্গচিত্র হত বটে। হাসতে পারব ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিলাম হ্যারিয়েটের দিক থেকে।

'চিত্রবিদ্যার পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার ক'রে ছবি আঁকা নিয়ে বলতে শুরু করলাম তাকে। মন দিয়ে শুনে, সেই অপ্রচলিত শব্দগুলোর মানে বুঝে আমার কথার ভিতরে সে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে বলে উঠত, 'বুঝেছি, বুঝেছি। ভারি চমৎকার ত।' আমরা বাড়ী ফিরে আসতাম।

'পরের দিন, আমাকে দেখে, হাত এগিয়ে দিয়ে, ব্যগ্র পদক্ষেপে এগিয়ে এল হ্যারিয়েট। পরম বন্ধু হয়ে উঠলাম আমরা দুজনে।

'মিস্ হ্যারিয়েটের প্রকৃতি নির্ভীক এবং মনটা এখনও স্থিতিস্থাপক—

একটুতেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আর পঞ্চাশ বছরের কুমারীর পক্ষে যা হওয়া সম্ভব—মনে স্থৈর্যের অভাব। তার সরলতা একটু বিস্বাদ ঠেকলেও কুমারী-সুলভ ভাবালুতা এবং যৌবনের স্মৃতি এখনও লেগে রয়েছে মিস্ হ্যারিয়েটের মনে। প্রকৃতি, পশু, পক্ষীর প্রতি তার আবেগ-ময় ভালোবাসা বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে পুরোনো মদের মত পরিপক্ব। কোনোদিন কিন্তু মানুষকে সে এ প্রেম দিতে পারে নি।

তার সম্বন্ধে একটা জিনিষ নিশ্চয় ক'রে বলা যায়: একটী সবৎসা গাভী, বাচ্চায় ভরা একটী পাখীর বাসা—রোমহীন বড়-মাথা বাচ্চাগুলো কিচ্‌মিচ্ করছে—এ সব দেখলে আবেগের আতিশয্যে সে আর স্থির থাকতে পারে না।

'হে নিঃসঙ্গ দুঃখিনীরা, ইউরোপের হোটেল থেকে হোটেলান্তর-চারিণী হাস্যকর করুণার পাত্রীরা, মিস্ হ্যারিয়েটের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই তোমাদের আমি ভালোবাসি।

'মনে হ'ল কি যেন সে বলতে চায় আমাকে, কিন্তু ব'লে উঠতে পাচ্ছে না। তার ভীরুতায় হাসি পেল আমার। বাক্স কাঁধে ক'রে সকালে যখন বেরুই, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত, কথা বলে না বটে তবে কি একটা বলবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করে। তারপরে হঠাৎ খট্‌খট্ করতে করতে ক্ষিপ্রপদে চলে যায়।

'একদিন সাহস ক'রে বলে ফেলল,

"আপনি কেমন ক'রে ছবি আঁকেন দেখতে আমার ভারী ইচ্ছে করে।" ব'লেই একেবারে লাল হয়ে উঠল, যেন কী একটা বেয়াদবী ক'রে ফেলেছে।

'পেতিভালের নিম্নপ্রান্তে আমরা দুজনে এসে পৌঁছুলাম—পেতি-ভাল্ ছোট উপত্যকা।

'কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত সঞ্চালন স্থির মনোনিবেশে দেখতে লাগল। বোধ হয় তার মনে হল আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তাই হঠাৎ 'ধন্যবাদ' বলে চ'লে গেল।

'অল্পদিনেই পরিচয় গভীরতর হতে সে রোজই আমার সঙ্গে আসত, তার মুখে পড়ত স্পষ্ট আনন্দের ছাপ। ভাঁজ করা চেয়ারটা পেতে বসত আমার পাশে আবার সেটা নিজেই বয়ে আনত, নিয়ে যেত; আমাকে কিছুতেই বইতে দিত না। তুলির প্রতিটি টান নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে ব'সে ব'সে নিরীক্ষণ করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে। কোনো একটা রঙে আশাতীত সৌন্দর্য্য ফুটে উঠতেই সে কখনও বিস্ময়ে, কখনও আনন্দে চাপতে গিয়েও উচ্ছ্বাস চাপতে পারত না, 'ওঃ', ব'লে উঠত। আমার ছবিগুলি প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টির মানুষী রূপায়ণ ছাড়া ত কিছু নয়। তবু সেগুলির প্রতি মিস্ হ্যারিয়েটের একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা, একটা স্নিগ্ধ আগ্রহ ছিল। ছবিগুলি তার কাছে পবিত্র বলে, মাঝে মাঝে ভগবানের কথা এনে ফেলে নিজের মতে আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত।

'মিস্ হ্যারিয়েটের ভগবান বড় অদ্ভুত। তিনি যেন একটা শান্ত, শিষ্ট ছেলে—খুব জোর তাঁকে গাঁয়ের বুড়ো মোড়ল বলা চলে, তাঁর বুদ্ধির দৌড়ও বেশী নয়, ক্ষমতাও তথৈব চ। তিনি জগতে অন্যায় দেখে কাঁপতে থাকেন, কিন্তু সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারেন না।

'অবশ্য মিস্ হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব; জগৎ-ব্যাপারের অনেক গোপন তথ্য জানে মিস্ হ্যারিয়েট। সে বলত:

"ভগবানের এই অভিপ্রায়; ভগবান এ চান না," যেন কোনো সার্জেন্ট্ কর্ণেলের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে কোন নবাগতের কাছে,

"কর্ণেলের এই আদেশ।"

'মনে মনে তার ভারী দুঃখ যে ভগবানের অভিপ্রায়ের আমি কিছুই

জানি না। তাই আমাকে আলোকে নিয়ে যাওয়া তার একান্ত কর্তব্য ব'লে মনে হল।

'প্রায় প্রতিদিনই, জামার পকেটে, টুপীর মধ্যে, রঙের বাক্সে, এমন কি পালিশ করা জুতোর মধ্যে পর্যন্ত সেই বই পেতে আরম্ভ করলাম। এগুলি নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে সোজা মিস্ হ্যারিয়েটের কাছে আসত।

'পুরোণো বন্ধুর মত অকৃত্রিম সৌহার্দ্য-পূর্ণ ব্যবহার করতে করতে মনে হল মিস্ হ্যারিয়েট কোথায় যেন একটু বদলেছে। প্রথম প্রথম এই পরিবর্তনের প্রতি তেমন নজর দিই নি।

'যেখানেই যাই হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—যেন তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে ফিরছে, সে গলি ঘুঁজিতেই হোক বা উপত্যকার উপরেই হোক। দেখা হওয়ামাত্র হাঁফাতে হাঁফাতে ব'সে পড়ত; মনে হত যেন ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিংবা কোন গভীর আবেগে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। মুখ লাল হয়ে উঠত; ইংরাজ ছাড়া সে রকম লাল অন্য কোন-দেশী লোকের হতে পারে না। তারপরে, কোনো কথা নেই বার্তা নেই একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে যেন মূর্চ্ছা যাবার মত হত। ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক হয়ে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করত।

'আবার কথার মাঝখানেই লাফিয়ে উঠে প'ড়ে এত বেগে চলে যেত দ্রুত গতিতে যে মাঝে মাঝে ভেবেই ঠিক করতে পারতাম না আমার কোন কথায় কি ব্যবহারে চটে গেল কি না।

'ভাবতাম এই রকমই বুঝি ওর ছোটবেলা থেকে শিক্ষাদীক্ষা; আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর হয়ত একটু সামলে সুমলে চলে এই পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে।

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোড়ো হাওয়ায় বেলাভূমিতে বেড়িয়ে যখন সরাইতে ফিরে আসত হ্যারিয়েট তখন তার দীর্ঘ, কোঁকড়ানো চুল বিপর্যস্ত হয়ে

পড়ত ঝুলে, যেন সব বাঁধন ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে। হ্যারিয়েটের নিজের কিন্তু লক্ষ্যই নেই সে দিকে। সেই অবস্থাতেই সে খেতে বসেছে কতদিন।

তারপরে সে তার ঘরে যেত, আমি যাকে বলি তার কাঁচের বাতি, তাই সাজাতে। পরিচিতের অধিকারের জোরে একটু বেপরোয়া হয়ে যেই বলতাম 'আপনাকে আজ তারার মত সুন্দর দেখাচ্ছে মিস্ হ্যারিয়েট, অমনি সে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। পনের বছরের কুমারীর মত লাল হয়ে উঠত তার মুখ।

'তারপরেই রূঢ় হয়ে উঠে ছবি-আঁকা দেখতে আসা বন্ধ ক'রে দিত। আমি ভাবতাম, 'রাগ প'ড়ে গেলেই আসবে আবার।'

'কিন্তু সব সময় পড়ত না সে রাগ। মাঝে মাঝে কথা বলতে গেলে হয় অবজ্ঞায় নয়ত চাপা রাগে উত্তর দিত; রূঢ়, অধৈর্য, চঞ্চল হয়ে উঠত কয়েকদিন খাবার সময় ছাড়া দেখাই হত না; কথা হতই না প্রায়। শেষে ঠিক করলাম, নিশ্চয়ই হ্যারিয়েট চটেছে আমার ওপর; তাই একদিন সন্ধ্যায় বললাম,

"মিস্ হ্যারিয়েট, আপনি ত আর আগের মত নেই। আমি কি কোন অন্যায় করেছি আপনার প্রতি? মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি আমি।"

ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দিল সে; সে রকম স্বর শুনি নি কোনদিন:

"আপনি ভুল করেছেন, ভুল করেছেন; আমি ত সেই রকমই আছি," ব'লেই ছুটে উপরে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা দিল বন্ধ ক'রে।

'মাঝে মাঝে অদ্ভুত চোখে তাকাত আমার দিকে মিস্ হ্যারিয়েট। মনে মনে বলতাম, ফাঁসীর আসামী তার শাস্তির কথা জানতে পেরে অমনি ক'রে তাকায়। হ্যারিয়েটের চোখে নির্বোধ রহস্যময় ভীষণ দৃষ্টি উঁকি দিত—শুধু ভীষণ নয়, দেখে মনে হত তার যেন জ্বর হয়েছে, অন্তরে

তার অসহ্য কামনা ; উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু সে কামনা সফলও হয় না, সফল হবারও নয়।

'এমন কি আমার মনে হত, তার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে—সে একটা অজানা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে জয়ী হবার জন্যে—হয়ত বা আর কিছুও হতে পারে। আমি সে কথা জানব কেমন ক'রে? কী-ই-বা আমি জানতে পারি?

৩

'এ এক অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল।'

'দিন কয়েক থেকে আমি ভোরে উঠেই আঁকতে বেরিয়ে যাই। আঁকার বিষয়-বস্তুটা হল এই :

'একটা গভীর খাদের দুদিকে খাড়া পাহাড়—পাশে ঢালু হয়ে গিয়েছে। তার ওপর গজিয়েছে কাঁটা গাছ, দীর্ঘ গাছের শ্রেণী—সব দুধ-রঙা কুয়াসায় ঢাকা। সকাল বেলায় প্রকৃতির স্বচ্ছ বাস যেন আন্দোলিত হচ্ছে হাওয়ায়। সেই ঘন, স্বচ্ছ কুয়াসার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা যুগল মূর্তি, পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ তরুণ আর তরুণী। মেয়েটির মাথা ছেলেটির গায়ে হেলে পড়েছে ; ছেলেটিও তন্মুখী। পরস্পরের ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ।

'গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের একটা রশ্মি সকালের কুয়াসা ভেদ ক'রে, ঠিক ঐ যুগল প্রেমিকের পেছনে, রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের অস্পষ্ট ছায়া উজ্জ্বল রূপোলি আলোয় প্রতিভাত হয়েছে কুয়াসার ওপর।

'ছবিটা সত্যিই ভালো এঁকেছি।

'আমি যে উৎরাইটায় ব'সে ছবি আঁকছি সেটা চলে গিয়েছে এত্রেতার দিকে। যে রকমটি চাই ঠিক সেই রকমের কুয়াসাটি পেয়ে গিয়েছি

আজ। হঠাৎ কি একটা এসে পড়ল সামনে, একটা ছায়া যেন; আর কেউ নয়, মিস্ হ্যারিয়েট। আমাকে দেখেই সে দিলে ছুট। আমি তাকে ফিরে ডাকলাম, "শুনুন, মাদ্‌মোয়াজেল, একটা চমৎকার ছবি দেখে যান।"

'একটু অনিচ্ছাতেই সে এগিয়ে এলে ছবিখান দিলাম তার হাতে। সে কিছুই না ব'লে বহুক্ষণ চুপ ক'রে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে কান্না চাপবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর যেমন নিতান্ত অনিচ্ছাতে মানুষ ঝোঁকে ঝোঁকে কেঁদে ওঠে তেমনি ক'রে সে কাঁদতে লাগল। বুঝলাম না কেন এ শোক; বিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আকস্মিক স্নেহের আবেগে তার হাত চেপে ধরলাম। বুঝলাম না কি করছি।

'কয়েক মুহূর্ত্ত শিউরে শিউরে উঠতে লাগল তার হাত আমার হাতে— যেন মনে হল তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী মুচড়ে মুচড়ে উঠেছে। তার পরে ঝপ্ ক'রে টেনে নিল সে হাতটা, ছিঁড়ে নিল বলা চলে।

'হাতের সে কম্পনের অর্থ বুঝতে আমার দেরী হল না। দেখলাম, ভুল আমি কিছুই বুঝিনি। পনের বছরের কুমারীরই হোক আর পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধারই হোক্, আর প্রগতিশীলারই হোক, প্রেমের কম্পন এত সহজে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে যে বুঝতে আমার কোনদিনই কষ্ট হয় না!

'তার সমস্ত পেলব সত্তা কেঁপে, অনুরণিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। বুঝলাম আমি সবই। চলে গেল সে; একটা কথা আমি বলবার অবকাশ পেলাম না। আমাকে স্তম্ভিত ক'রে অঘটন ঘটে গেল একটা। এমন কষ্ট হল মনে, যেন আমি কি একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি।

প্রাতরাশ খেতে না গিয়ে ফালেজের তীরে বেড়াতে লাগলাম। মনে ভাবলাম, আমি এখন হাসতেও পারি কাঁদতেও পারি; ঘটনাটা

করুণও বটে হাস্যকরও বটে। কিন্তু আমার অবস্থাটা হাস্যকর ছাড়া আর কি ? ভাবতে ইচ্ছে হল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।

'কি করা উচিত এখন ? তখনই ঠিক ক'রে ফেললাম এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে ঘুরে দুপুরবেলা সকলের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন এলাম গোলাবাড়ীতে।

'যেমন রোজ বসি তেমনিই বসলাম টেবিলে ; মিস্ হ্যারিয়েট ধীরে ধীরে খেয়ে চলেছে, নির্বাক, অবনতমুখী। মুখে, ব্যবহারে সহজ ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে।

'খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে রইলাম ধৈর্য ধ'রে। তারপরে সরাইউলীর দিকে ফিরে বললাম, "মাদাম্ লেকাশূর, আমাকে বোধ হয় শীগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

'সে অতশত বোঝে না। বিস্মিত ক্লিষ্ট হয়ে কম্পিত স্বরে সে বললে, "এ আপনি কি কথা বলছেন ? এ্যাদ্দিন পরে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন কি রকম !"

'আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মিস্ হ্যারিয়েটের মুখের ভাবের কোনই পরিবর্তন হয় নি। পরিচারিকাটা কিন্তু বড় বড় চোখ করে এগিয়ে এল আমার কাছে ! মোটা সোটা বছর আঠারর মেয়ে, টুকটুকে রং, সজীব চেহারা, গায়ে বেশ জোর। আর একটা গুণ তার ছিল যেটা তার স্থানীয় কোন মেয়ের মধ্যেই দেখা যায় না— সে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে মিশেলে, এখানে সেখানে, নির্জন জায়গায় তাকে চুমো খেয়েছি। অবশ্য সে এমনিই।

'খাওয়ার পরে আপেল গাছের তলায় প্রাঙ্গণের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছি পাইপ মুখে দিয়ে—মনের মধ্যে ভিড় ক'রে

আসছে অসংখ্য ভাবনা, সারা দিনে যত কথা ভেবেছি সব : সকালের অদ্ভুত আবিষ্কার, আমার প্রতি তার তীব্র, হাস্যকর আকর্ষণ ; হঠাৎ হ্যারিয়েটের হৃদয়াবেগের উদ্ঘাটনে মনে আরও সব মনোরম, বিচিত্র স্মৃতির আসা যাওয়া, আমার চলে যাবার কথায় পরিচারিকার সেই দৃষ্টি— এই সব কিছু মিশে, জড়িয়ে আমার দেহে এনে দিল অদ্ভুত উত্তেজনা, চুম্বনের শিহরণ লাগল সারা গায়ে ; রক্তে কি একটা কেবলই তাড়া লাগাল কোন্ নির্বুদ্ধিতার দিকে।

'গাছের তলায় বড় বড় কালো ছায়া ফেলে রাত্রি এল। দেখলাম উঠোনের ও-ধারে মুরগীর খোপ বন্ধ করতে গিয়েছে সেলেস্ত। আমি এমন নিঃশব্দে ছুটে গেলাম তার দিকে যে সে জানতেও পারলনা ; আর যেমনি খোপগুলো বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার স্থূল গালে চুমো-বৃষ্টি ক'রে দিলাম। এইরকম ক্ষেত্রে সে যেরকম ক'রে থাকে তেমনি ভাবে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা ক'রে হাসতে লাগল। কিন্তু আমার হাত খুলে প'ড়ে গেল কেন? হঠাৎ এ কী হল? পেছনে কিসের শব্দ? ছায়ামূর্তির মত নিশ্চল হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে মিস্ হ্যারিয়েট ; সে সব কিছু দেখে শুনে এসে দাঁড়িয়েছে ভূতের মতন। তারপরেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'লজ্জিত, বিব্রত, বিরক্ত হয়ে উঠলাম এইভাবে অতর্কিতে লক্ষিত হয়ে। একটা অপরাধ করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেলেও এত বিচলিত হতাম না।

'ভালো ঘুম হল না রাত্তিরে ; বিষণ্ণ চিন্তা সব ঘোরাফেরা করতে লাগল মনে ; যেন কার তীব্র কান্নার ধ্বনি কানে এল। কান্নাটা স্বপন নয়। সারা বাড়ীময় কার ঘুরে বেড়ানোর শব্দ পেলাম। শেষে কে যেন আমার ঘরের দরজা খুলল।

'সকালের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। দেরীতে উঠে প্রাতরাশের আগে আর নীচে নামা হল না। মনটা এমনিই অসাব্যস্ত হয়ে আছে যে কি ভাবে গিয়ে টেবিলে বসব বুঝতে পাচ্ছিলাম না।

'মিস্ হ্যারিয়েটকে কেউ দেখে নি সকাল থেকে। টেবিলে আমরা অপেক্ষা করার পরেও তার দেখা পাওয়া গেল না। শেষে মাদাম্ লেকাশূর তার ঘরে গিয়ে দেখল মিস্ হ্যারিয়েট ঘরে নেই--বোধ হয় অভ্যাসমত সূর্যোদয় দেখতে গিয়ে একটু দেরী করছে।

'কেউই বিস্মিত হল না; নীরবে খেতে লাগল সকলে।

'গুমোট গরম—গাছের পাতাটি নড়ছে না। বাইরে আপেল গাছের তলায় টেবিল পড়েছে। গরমের ঠেলায় মাঝে মাঝেই সাপ্যুরকে ঘর থেকে সাইডার নিয়ে আসতে হচ্ছে আমাদের তৃষ্ণা মিটোতে। সেলেস্ত আনছে রান্নাঘর থেকে খাবার একে একে। শেষে সেলেস্ত্ আমাদের সামনে ধরে দিল এক পিরিচ স্ট্রাবেরি—সেই বছরের প্রথম ফলন।

'ফলগুলি ধুয়ে একটু তাজা ক'রে নেবার জন্যে ঝিকে কুয়ো থেকে এক বালতি ঠাণ্ডা জল তুলে আনতে বললাম।

'মিনিট পাঁচেক পরে সে ফিরে এসে বললে কুয়ো শুকিয়ে গিয়েছে! ঘড়া শেষ পর্যন্ত নেমে তলে ঠেকে গিয়েছে; তুলে দেখেছে ঘড়া খালি। ব্যাপারটা কি ভালো ক'রে দেখবার জন্যে মাদাম লেকাশূর নিজে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল গর্তটায়। এসে বলল "অদ্ভুত কি একটা দেখা যাচ্ছে কুয়োর মধ্যে।" নিশ্চয়ই প্রতিবেশীরা হিংসে ক'রে খড়ের আঁটি ফেলে দিয়েছে কুয়োর ভেতর।

'সব রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে দেবার আশায় একেবারে ধার ঘেঁষে গিয়ে উঁকি মারলাম। শাদা মত কি একটা অস্পষ্ট দেখা গেল। কি এটা? মনে হল দড়ি বেঁধে একটা লণ্ঠন নামিয়ে দিলে হয়। নামিয়ে দিতেই

প্রথমে আলোটা পাথরের ওপর কেঁপে কেঁপে শেষে স্থির হল। সাপ্যুর আর সেলেস্ত শুদ্ধ আমরা চারজনেই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। একটা কালো শাদা অস্পষ্ট বস্তুপুঞ্জের ওপর গিয়ে পড়ল আলো। কিছুই বিশেষ বোঝা গেল না। অদ্ভুত জিনিষটা ব'লে মনে হচ্ছে। সাপ্যুর চেঁচিয়ে উঠল, "একটা ঘোড়া। আমি খুর দেখতে পাচ্ছি। মাঠ থেকে রাত্তিরে পালিয়ে আসতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছে নিশ্চয়।"

'হঠাৎ ভয়ে হিম হয়ে গেল গা : প্রথমে একটা পা, তারপরে কাপড়-চোপড়ে ঢাকা দেহের অংশ একটা দেখতে পেলাম। দেহটা ঠিকই আছে ; সামনের দিকটা ডুবে গিয়েছে জলের মধ্যে।

ভয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে এমন কাঁপতে লাগলাম যে আলোটাও কাঁপতে লাগল নীচে দেহটার ওপর—দুলতে লাগলে। দেখা গেল এক পাটী চটি।

"আরে! একজন মেয়েমানুষ যে! কে পড়ল এমন ক'রে? মিস্ হ্যারিয়েট না কি?"

'সাপ্যুর একা কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না। এ রকম আফ্রিকায় সে অনেক দেখেছে।

'সেলেস্ত্ আর মাদাম্ লেকাশ্যুর চীৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল ছুটে।

'কিন্তু মৃতদেহ ত তুলতে হ'বে। কপিকলে সাপ্যুরের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলাম অন্ধকার কুয়োর মধ্যে। এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে দড়ি ধরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে শব্দ উঠে এল,

"আর নামাবেন না।"

দেখলাম জল থেকে দেহের অপর অংশটা তুলে দড়ি দিয়ে পা দুটো বাঁধল। তারপরে চীৎকার ক'রে বলল,

"তুলুন"

'তুলতে সুরু করলাম; হাত ভেরে যাচ্ছে, আঙুল টন্‌টন্ করছে; ভয় লাগছে পাছে ছেলেটাকে ফেলে দিই। তারপর মাথাটা দেখা গেলে জিজ্ঞাসা করলাম,

"কি দেখলি?" যেন তার বলার আশাতেই আমি অপেক্ষা ক'রে আছি।

তারপর দুজনে, কুয়োর ধারে রাখা পাথরের চাবলায় পা ঠেকিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টেনে তুলতে লাগলাম শবটা।

'দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে সেলেস্ত্ আর মাদাম্ লেকাশূর দূর থেকে আমাদের দেখছিল। কুয়োর গর্তের মধ্যে থেকে দুপাটি কালো চটি আর শাদা মোজা দেখা যেতেই তারা অন্তর্হিত হল।

'বেচারী সতীর দেহ উঠে এল অশ্লীলতম ভঙ্গীতে। আমি আর সাপ্যুর তার গোড়ালি ধরে টেনে তুললাম। মাথাটা ভেঙে চূরে কালো হয়ে গিয়েছে; লম্বা, শাদা চুল এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে ঝুলছে।

'সাপ্যুর ঘেন্নায় ব'লে উঠল, "ইস্, চেহারা ত নয়, একেবারে প্যাকাটি!"

'মেয়েরা কেউ এল না দেখে শব ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এসে ছেলেটার সহায়তায় তাকে সৎকারের সাজ পরালাম।

'তার ক্ষত-বিক্ষত মুখ দিলাম ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে। হাত লেগে একটা চোখের পাতা খুলে যেতেই চোখ রইল তাকিয়ে—সে কী পাণ্ডুর, প্রাণহীন দৃষ্টি—সে দৃষ্টির বিভীষিকা যেন মৃত্যুর ওপার থেকে এসেছে। তার বিপর্যস্ত চুলে গুচ্ছ তৈরী করলাম নিপুণ হাতে—অবশ্য আমার

নিপুণতা, বুঝতেই পাচ্ছ। কপালের ওপর তৈরী করলাম বিচিত্র অলক। তারপরে খুলে দিলাম তার ভিজে কাপড়-চোপড়—লজ্জা লাগল একটু—তার এতদিনের অপাপবিদ্ধ কুমারীর দেহ। খুলে দিলাম বাহু, বুক, কাঁধ—সরু কাঠির মত বাহু।

'শবাধারে ছিটিয়ে দেবার জন্যে ফুল তুলে নিয়ে এলাম—বুনো আফিম ফুল, নীল বিটল্, মাগু'য়েরাইট, টাটকা সুগন্ধ শষ্পগুচ্ছ।

'শবের কাছে আমি একা—সব কৃত্য আমাকেই করতে হল। পকেটে পেলাম হ্যারিয়েটের শেষ মুহূর্ত্তের একটা চিঠি—যে গ্রামে জীবনের শেষ দিন ক'টা কেটেছে সেই গ্রামেই তার দেহ গোর দেবার অনুরোধ জানিয়েছে। একটা ভীতিপ্রদ চিন্তা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলল। আমার জন্যেই সে কি মরণের পরেও এ গ্রাম ছাড়তে চাচ্ছে না।

'সন্ধ্যার দিকে পাড়া-বেড়ানী সব মাসী পিসীর দল দেখতে এল মৃতদেহ। কাউকে ঢুকতে দিলাম না। একা সারা রাত্রি বসে রইলাম সেই আত্মঘাতিনীর পাশে—জেগে।

'বাতির কম্পিত আলোয় হতভাগিনীর অপরিচিত দেহের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম: আপনার জনের কাছ থেকে কতদূরে এমনি করুণভাবে মরল মিস্ হ্যারিয়েট। আপনার জন কি কেউ আছে এর? কেমন ক'রে কেটেছে এর শৈশব? সারাজীবন কি ভাবে যাপন ক'রে গেল? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে-দেওয়া কুকুরের মত কখন সে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল? ঐ শুষ্ক, শীর্ণ, কুশ্রী দেহটার মধ্যে কোন্ বেদনার, হতাশার গোপন কথা লুকোনো ছিল? কোন্ রহস্যের দুর্জ্ঞেয় নিকেতন ঐ দেহটা স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীতে?

'এই রকম হতভাগিনী আরও কত আছে? না অনুভব ক'রে

পারলাম না যে ঐ ক্ষীণ নারীর ওপরেও চেপে রয়েছে প্রকৃতির চিরকালের দুরপনেয় অন্যায়ের ভার! ও ম'রে গেল কিন্তু একবারও জীবনে পেল না ভালোবাসার আস্বাদ—ভালোবাসা, যা ব্যর্থতম জীবনকেও বাঁচিয়ে রাখে। ওকে কেউ ভালোবাসেনি। তা না হলে কেন ও এমনি ক'রে নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত, সকলের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকত? কেন তা না হলে, মানুষ ভিন্ন আর সব কিছুকেই সে অমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত?

দেখেছি সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, বিশ্বাস করত তার সমস্ত দুঃখ তিনি আনন্দে ভ'রে দেবেন। এতক্ষণে তার দেহ সুরু করল পচতে, গাছের সারে পরিবর্তিত হ'তে। যে একদিন ফুটে উঠেছিল সূর্যের আলোয় তাকে এখন পশুতে খাবে; ঘাস-পাতার রূপে লোকে তুলে নিয়ে যাবে, খাওয়াবে গৃহ-পালিতদের; পশুদেহে-পরিবর্তিত হয়ে আবার সে মানুষের দেহে রূপান্তরিত হবে। হ্যারিয়েটের দেহ ঘুরবে এই চক্রে। কিন্তু যেটা হ্যারিয়েট, যেটা তার আত্মা সেটা কুয়োর অন্ধকারতলে নিভে গিয়েছে। তার আর কোনো বেদনা নেই এখন। নিজের দেহ সে নষ্ট করল, যারা এখনও জন্মাবে তাদের পরিপুষ্টির জন্যে।

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি ক'রে নিঃশব্দে কাটল মৃতের সঙ্গে ভীতিপ্রদ আলাপনে। নতুন দিনের প্রভাতের বার্তা নিয়ে এল পাণ্ডুর আলো; বিছানার ওপর এসে পড়ল, দীপ্ত হয়ে উঠল চাদর, বালিশ আর হ্যারিয়েটের হাত দুটো। এই ক্ষণটি-কে সে বড় ভালোবাসত—এই এখনি পাখীরা সব জেগে উঠে গান করতে শুরু করল।

'জানলাটা প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে খুলে দিয়ে পর্দা সরিয়ে দিলাম; সারা আকাশ যেন স্পর্শ করল আমাদের। হ্যারিয়েটের দেহ কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল; ঝুঁকে প'ড়ে তার বিকৃত মাথা দুই হাতে ধ'রে, ধীরে, দীর্ঘ,

সুদীর্ঘ একটা চুম্বন ঠোঁটে এঁকে দিলাম তার; একটু ঘৃণা, একটু ভয় হল না মনে! সে আজ প্রথম পেল প্রেমের প্রণাম।'

* * *

লেও শেনালের কথা ফুরোল; কাঁদতে লাগল মেয়েরা। শুনতে পেলাম কোচবাক্সে কাউন্ট দেত্রাই মাঝে মাঝে নাক ঝাড়ছেন। শুধু কোচয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে। চাবুকের ঘা না পড়ায় গতি শ্লথ ক'রে ঘোড়াগুলো চলেছে মন্থর গমনে। প্রায় গতিহীন গাড়ীটা হঠাৎ যেন দুঃখের ভারে গিয়েছে অসাড় হয়ে।

মরণের পরে

বাদোঁ লেরোমিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা বেজিয়ার্স-লে-রেতেল্ যোগ দিয়েছিল ; জেলার প্রতিনিধি বক্তৃতার উপসংহার করলেন, "ভদ্র-লোকের প্রকৃতি অন্তত সাধু ছিল", ব'লে।

তার কথায়, তার দৃষ্টান্তে, তার ভাবে ভঙ্গীতে, প্রতি পদক্ষেপে, দাড়ি রাখার ধরণে, এমন কি টুপীর গড়নে পর্যন্ত তার সাধুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কখনও দৃষ্টান্ত না দিয়ে সে কথা বলে নি ; ভিক্ষার সঙ্গে একটু উপদেশ মিশিয়ে সে দিতই ; কারও হাত ধরলে মনে হত তাকে যেন আশীর্ব্বাদ করছে।

একটা ছেলে, একটা মেয়ে রেখে ভদ্রলোক মারা গেল। ছেলে রাষ্ট্রীয় সভাসদ্ ; আর মেয়ে এক কোর্টের নথি-পত্র-পরীক্ষককে বিয়ে ক'রে বেজিয়ার্সের সমাজে খ্যাতনাম্নী—স্বামীর নাম পোয়ার্ল স্থ লা বুল্‌ত।

বাপকে সত্যিই ভালোবাসত তারা ; তাই শোকে কোনো সান্ত্বনাই পাচ্ছিল না।

সৎকার শেষ হওয়ামাত্র শোক-সন্তপ্ত গৃহে মেয়ে, জামাই, ছেলে তিনজনেই ফিরে এসে বাপের উইল খুলে বসল। উইল শুধু তারাই খুলবে তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে—উইলের খামের ওপরে এই অনুরোধ ছিল।

পোয়ার্ল'এর নথিপত্র দেখাই কাজ। চোখে চশমা এঁটে গলায় সরকারী সুর চড়িয়ে পড়তে লাগল উইলটা :

'তোমরা আমার ছেলে-মেয়ে—আমারই একান্ত ভালোবাসার ধন ; তাই মৃত্যুর এপার থেকে তোমাদের কাছে আজ একটা পাপ স্বীকার

ক'রে না নিলে মৃত্যুতে আমি শান্তি পাব না। সেই পাপের অনুশোচনায় আমি সারাজীবন দগ্ধ হয়েছি। একটা ঘৃণ্য, ভয়াবহ পাপ করেছিলাম আমি।

'আমার বয়েস তখন ছাব্বিশ, সবে পারীতে ওকালতি শুরু করেছি। গাঁ থেকে ছেলেরা এসে যেমন জীবন কাটায় তেমনিই কাটাচ্ছি। কোথায় এসে পড়েছি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না; না আছে কারও সঙ্গে জানাশোনা না আছে কোনো বন্ধুবান্ধব, না আছে এখানে বাপ মা।

'একটা মেয়েকে রাখলাম। মেয়েমানুষ রেখেছে শুনলেই অনেকে চটে যায় কিন্তু একা থাকতে ত সকলে পারে না। আমিও ঐ রকম—একা থাকতে পারি না। নির্জনতায় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে—বিশেষ ক'রে বাসাবাড়ীতে অগ্নিকুণ্ডের ধারে সন্ধ্যাবেলায়। মনে হয় পৃথিবীতে আমি একা, ভীষণ একা, আমার চারিদিকে বিপদের, অজানা ভয়ের সব অস্পষ্ট ছায়া। ঐ কাঠের পার্টিশনটুকুর ওধারে অপরিচিত বাড়ীওয়ালা ঐ আকাশের তারার মতই সুদূরে। ভয়ে, অধৈর্যে আত্মহারা হয়ে যাই আমি; ঘরের নিস্তব্ধতা যেন গিলে খেতে আসে। তোমরা জান না একলা ঘরের কী গভীর বিষাদ। মনের চারিদিক ঘিরে সেই নিঃসঙ্গতা; একটু কিছু শব্দ হলেই ভয় লাগে। এই বিষণ্ণ ঘরে কেউ আসবে এ ত ভাবতে পারা যায় না।

'কতবার এই নির্বাক প্রাণহীনতায় ভয়ে বিকল হয়ে আপন মনেই যা তা বকে যেতাম—শুধু একটু শব্দ হবে ব'লে। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেরই চমক লাগত। খালি বাড়ীতে একলা কথা ব'লে বেড়ানোর মত বিভীষিকাময় আর কিছু আছে না কি? মনে হয় যেন আর একজনা কথা বলছে—অন্যের গলার আওয়াজ। কাকে কথা বলছে, কে শুনছে? কেউ না; শুধু ফাঁকা বাতাস। কি বলছে? সে ত বলবার আগেই

জানা। সেই বিষণ্ণ কথাগুলো নিস্তব্ধতার মাঝে প্রতিধ্বনির মত শোনায় —মনের চুপি চুপি কথা যেন।

'চাকরি করে অথচ পেট ভরে না এই রকম বহু মেয়েই ত প্যারীতে আছে। তাদেরই একজনাকে রাখলাম। মেয়েটি বেশ, তার বাপ মা থাকে পোয়াসিতে। মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্যে সেও যেত সেখানে।

'বছর খানেক খাসা শান্তিতে কাটল। মনে মনে ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম যে মনের মত কাউকে পেলেই একে ছেড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করব। তবু আমাদের সমাজে প্রেমের মূল্য দেওয়া প্রথা; দরিদ্রা হলে টাকা দিয়ে আর ধনিকা হলে হীরে-জহরতে।

'কিন্তু সে এসে একদিন জানালে কি জান? সে অন্তঃসত্ত্বা। হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম এক মুহূর্তে আমার জীবনের সর্ব্বনাশ দেখে। বাঁধন উঠল স্পষ্ট হয়ে। ভবিষ্যতে বুড়ো বয়েসে, সব সময় সন্তানের বাঁধনে বাঁধা এই স্ত্রীলোকটার ভার আমাকে ব'য়ে বেড়াতেই হবে—সেই ছেলেকে মানুষ করতে হবে, তাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে হবে—অথচ সব লুকিয়ে, আমার পিতৃত্ব গোপন ক'রে। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। মনে জাগতে লাগল আবছায়া কামনা; সে কামনা আলোয় আসেনি তখনও, পর্দার আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারছে বাইরে আসবার জন্যে। নৃশংস কামনা মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে: একটা দুর্ঘটনা! ব্যস্! পেটে থাকতেই ত কত ছেলে মরে যায়!

'না, না আমি আমার রক্ষিতার মৃত্যু চাইনি। সে বেচারীর কি দোষ! তাকে আমি ভারী ভালোবাসি। আমি বোধ হয় চেয়েছিলাম সেই ভ্রূণের মৃত্যু, তাকে দেখবার আগেই তার মৃত্যু।

'জন্মাল সে। অবিবাহিতের বাসায় পাতা হল মিথ্যে ঘরকন্না। সেও সইতে হল। শিশুর এমন কিছুই বৈচিত্র্য নেই; সব শিশু যেমন হয় তেমনি। আমার তাকে ভালোই লাগত না। বাপেদের ভালো-বাসতে একটু দেরী লাগে। মায়েদের হৃদয়ের অপূর্ব, সহজ ভালোবাসা তারা কোথায় পাবে? সজীব প্রাণীরা একসঙ্গে থাকলে যে আকর্ষণ জন্মায় শিশুর প্রতি বাপের ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণ জন্মাতে থাকে; তা ছাড়া কিছু নয়।

'এক বছর কেটে গেল। বাড়ী থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। একে ত ছোট বাড়ী, তার ওপর এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছেলের জামা কাপড়, বিছানা, ছোট্ট ছোট্ট মোজা। আসবাবপত্রের ওপর প'ড়ে ত থাকতই; বিশেষ ক'রে থাকত আরাম কেদারার হাতলের ওপর। ছেলেটার কান্না পাছে শুনতে হয় এই ভয়েতেই আমি আরও পালিয়ে বেড়াতাম। সব সময়েই ছেলেটা কাঁদত কি না: জামা পরাতে, স্নান করাতে, শোয়াতে এমন কি কোলে নেওয়ার সময়েও। অবিরাম কেঁদে যেত।

'আমার পরিচয়ের পরিধি বাড়তে বাড়তে, তোমাদের যে মা হ'বে তারও সঙ্গে হল দেখা। তাকে ভালোবাসলাম। বিয়ে করার ইচ্ছে দেখা দিল মনে। প্রেম নিবেদন ক'রে তার পাণিপ্রার্থী হলাম।

সে রাজী হল।

'আমার হল উভয় সঙ্কট: একটা ছেলের বাপ হয়েও সব লুকিয়ে কেমন ক'রে তাকে বিয়ে করি যাকে আমি সত্যাই শ্রদ্ধা করি, আবার তাকে সব কথা বলিই বা কি ক'রে। বলা মানেই ত সব সুখ, সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দেওয়া। তার বাপ মা বড় গোঁড়া, বড় খুঁত্‌খুঁতে। এ সব কথা জেনে তাকে আমার হাতে কখনই দেবে না।

'কিছুই ঠিক করতে পারি না ; নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হলাম এক মাস ধ'রে। হাজারো রকমের চিন্তা মনে হানা দিয়ে ভয় লাগিয়ে দিলে। মনে ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আমার এই সন্তানের ওপর, এই মাটির ঢেলার ওপর ভীষণ ঘৃণা। এই কাঁদুনে মাংসপিণ্ডটাই ত আমার পথের কাঁটা, মাটি করছে আমার সারাজীবন ; ফেলে দিচ্ছে আশাহীন জীবনের মধ্যে। আশা না থাকলে বাঁচব কি ক'রে ; অস্পষ্ট সব আশায় মুগ্ধ যৌবন।

'সেই সময় আমার সঙ্গিনীর মায়ের অসুখ হয়ে পড়ায় শিশুটিকে নিয়ে আমি একেলা পড়ে গেলাম। ডিসেম্বর মাস—অসহ্য শীত। সে কি রাত্রি! কাছে সে নেই। সঙ্কীর্ণ রান্নাঘরটায় কোনো রকমে খাওয়া সেরে, যে ঘরে শিশু ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করলাম।

'আগুনের ধারে বসলাম আরাম কেদারায়। শুক্‌নো তুষারের ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগছে কাঁচে ; জানলার বাইরে তুষারের মধ্যে দিয়ে দেখছি চিক্‌মিক্ করছে আকাশে তারা।

'এই একমাস ধ'রে যে চিন্তাটা হানা দিচ্ছে মনে সেইটে এসে ঢুকল মাথায়। চুপ ক'রে বসলেই কোথা থেকে নেমে এসে ঢোকে আমার মধ্যে, ঘুরে বেড়ায়, বিষাক্ত ঘায়ের মত দাঁত বসিয়ে বসিয়ে চলে যেন আমার মাংসের মধ্যে। মাথায়, বুকে, সারা দেহে সেই চিন্তার বিচরণ ; একটা পশুর মত সে গিলছে আমাকে। সকালে যেমন জানলা খুলে দিয়ে রাতের বদ্ধ বাতাস ঘর থেকে বের করে দেয় তেমনি করে আমি সেই ভাবনাটাকে ঠেলে, ধাক্কা মেরে বের ক'রে দিয়ে অন্য চিন্তা, অন্য আশার স্থান করতে চাইলাম মনে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে ছাড়ল না আমাকে। কি ক'রে বোঝাব তোমাদের সে কি গ্লানি! এই বারে

একেবারে মনের ভেতরে গিয়ে কুরে খাচ্ছে; আর আমি যন্ত্রণায় দুঃখে কুঁকড়ে উঠছি।

'জীবনের সব এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কি করে মুক্তি পাব এর থেকে? কি ক'রে নিজেকে সরিয়ে নেব, কি ক'রেই বা স্বীকার করব?

'এই দুর্লজ্ঘ্য বাধায় তোমাদের মায়ের ওপর আমার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল।

'ভীষণ ক্রোধে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—রাগে যেন পাগল হয়ে উঠলাম। সেই রাত্তিরে কিসে যেন পেয়ে বসল আমাকে!

'উঠে ঘুমন্ত শিশুটার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সেটাকে—একটা কীট, একটা গর্ভস্রাব, একটা—একটা কিছুই নয়—এইটে কিনা আমাকে এই অভিশপ্ত দুঃখের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

'আমারই বিছানার পাশে হাঁ ক'রে, কাঁথার মধ্যে দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর আমি শুতে পাচ্ছি না।

'কিন্তু এ আমি কি ক'রে ক'রলাম? কি জানি। কোন হিংস্র শক্তি আমাতে ভর ক'রে ঐ কাজ করালে? ওঃ, আমি জানতেও পারি নি কেমন ক'রে ঐ মহাপাপের প্রলোভন আমাকে পেয়ে বসল। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বুক ভীষণ ধড়্‌ফড়্‌ করছিল; যেন বুকের মধ্যে কে নির্মম হয়ে হাতুড়ি পিটছে। এইটুকু শুধু মনে আছে! অসহ্য বুক ধড়ফড়ানি। মাথার মধ্যে সব কখন গণ্ডগোল হয়ে গিয়ে একটা তুমুল হট্টগোল বেধে গিয়েছে সেখানে। কেমন একটা নীরন্ধ্র ঔদাসীন্য। ভাবতে একেবারেই পাচ্ছি না। কি যে করছি, কোন দিকে যাচ্ছি তা কিছুই আর মনে আসছে না। শুধু একটা ভীতিপ্রদ ভূতে-পাওয়া ভাব।

'আস্তে আস্তে তার গায়ের ঢাকাগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দোলনার পায়ের দিকে ; তাকিয়ে রইলাম উলঙ্গ শিশুর দিকে—সে জাগল না। ধীরে ধীরে গিয়ে জানলা খুলে দাঁড়ালাম।

'এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘাতকের মত ঘরে এসে ঢুকল ; এত ঠাণ্ডা যে আমি পেছিয়ে এলাম। কেঁপে উঠল বাতি দুটো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম জানলার ধারে ; পেছন ফিরে তাকাতে সাহস পাই না। মাথায়, কপালে, গালে, হাতে এসে লাগছে সেই মারাত্মক বাতাস। বহুক্ষণ কেটে গেল।

'মনটা একেবারে শূন্য। ভাবতে কিছু পাচ্ছিলাম না। একটা খুক্ ক'রে কাশির শব্দে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল। সে শিহরণ এখনও প্রতি রোমকূপে আমি অনুভব ক'রতে পারি। চকিত হয়ে তখনি জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে ছুটে এলাম দোলনার কাছে।

'উলঙ্গ শিশু হাঁ ক'রে ঘুমিয়ে চলেছে। ছুঁয়ে দেখি গা একেবারে হিম। তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়ে দিলাম। করুণায়, স্নেহে হৃদয় যেন ভেঙে পড়তে চাইল। এই নিরপরাধ শিশুকেই কি না আমি মারতে চেয়েছিলাম। তার পাতলা চুলে-ভরা মাথার ওপর বারে বারে চুমো খেয়ে ফিরে এসে বসলাম আগুনের ধারে।

'এ কী করলাম! শঙ্কায় ভ'রে গেল মন। ভাবতে লাগলাম, চেতনা মথিত করে এই সব ঝড় মনে কোথা থেকে আসে। নিজের ওপর তখন একটুও হাত থাকে না; একটা ভীতিপ্রদ মত্ততার বশে ঝড়ের মুখে জাহাজের মত কি সব তখন করে বসি, কোথায় যে যাই। কেন এমন হয়?

'শিশু আবার কেশে উঠতেই বেদনায় বিষিয়ে উঠলাম। যদি ও মারা যায়! উঃ ভগবান, কি হ'বে তাহলে?

'উঠে একটা বাতি নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখলাম সে শান্ত হয়েই ঘুমোচ্ছে। তাই সে তৃতীয় বার কেশে উঠলেও শঙ্কা হল না, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ধাক্কা লাগল মনে যে সেটাকে সামলাতে গিয়ে হাত থেকে বাতি পড়ে গেল। ভয় পেয়ে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'বাতিটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কপাল ঘামে ভিজে। একসঙ্গে আমার শীতও লাগছে গরমও লাগছে। একটা নারকীয় যন্ত্রণার আগুন মনের মধ্যে জ্বলে এমন অদ্ভুত কষ্ট দিচ্ছে যে কখনও শীতে কাঁপছি আবার পরক্ষণেই হাড় পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।'

'সকাল পর্যন্ত ছেলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম; সে চুপ ক'রে ঘুমোলে একটু নিশ্চিন্ত হই আর একটু কাশলেই বিশ্রী শঙ্কা আসে মনে।

'সকালে দেখলাম তার চোখ লাল, গাল-গলা ফুলেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। স্ত্রী ফিরে এসে তাকে দেখার পরেই ডাক্তার ডেকে পাঠালাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ডাক্তার এসে, পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করল,

"ওর কি ঠাণ্ডা লেগেছে?"

থুরথুরে বুড়োরা যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপতে কাঁপতে তো তো করে, বললাম,

"না, মনে ত হয় না," তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,

"ওর কি হয়েছে বলুন ত? কোনো ভয়ের কারণ আছে না কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,

"এখনও বলতে পাচ্ছি না; আজ সন্ধ্যেয় দেখে তবে বলতে পারব।"

'সারাদিন ছেলেটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েই রইল; মাঝে মাঝে কাশি। ডাক্তার এল সন্ধ্যাবেলা।

বললে, "নিউমোনিয়া।"

'দশ দিন কাটল। সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা থেকে সকাল শুধু ধিকি ধিকি অনুতাপের আগুন—সময় যেন আর শেষ হতে চায় না।

'আমার ছেলে মারা গেল।

'সেই মুহূর্ত থেকে আমার সারাজীবনে এমন একটা ঘণ্টাও কাটেনি যখন সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি আমাকে দংশে, ছিঁড়ে, শিকলে-বাঁধা পশুর মত মনের তলায় আছাড়ি-বিছাড়ি না করেছে।

'আঃ ভগবান্, যদি আমি পাগল হ'য়ে যেতে পারতাম!

'নথিপত্র পড়া শেষ ক'রে যে রকম অঙ্গভঙ্গীতে অভ্যস্ত সেই রকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে মঁসিয়ে পোয়াল-স্ত-লা-বুল্ত চশমা বন্ধ ক'রে রাখলে। তিনজনে পাংশুমুখে নিশ্চল হয়ে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মিনিট খানেক প'রে জামাই বললে,

"এটা ত নষ্ট ক'রে ফেলতে হয়।"

'বাকী দুজনে মাথা নীচু ক'রে সায় দিতে, একটা বাতি জ্বেলে, উইলের যে ক'খানা পাতায় এই বিপজ্জনক স্বীকৃতিটি ছিল সেগুলি টাকাকড়ির ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কাগজগুলি থেকে আলাদা ক'রে, আগুন ধরিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল।

'তাদের চোখের সামনে পুড়তে লাগল কাগজগুলো—একটু পরেই একটা কালো স্তূপ ছাড়া কিছুই রইল না। তবুও কয়েকটা অক্ষর একটু বোঝা যাচ্ছে দেখে মেয়ে সেই অংশটুকু পা দিয়ে গুঁড়িয়ে ছাইএর সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

'তারপরেও তিনজনে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল চুপ ক'রে; ভস্মীভূত গোপন কথা যদি চিমনি দিয়ে বাইরে উড়ে যায়!